The Time Machine / H. G. Wells

Translated by

Niranjan Singha

প্রথম প্রকাশ : জুন- ১৯৫৭

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/মডার্ণ কলাম ॥ ১০/২এ, টেমার লেন, কলি-৯। মুদ্রাকর : জি. শীল/২৭এ তারক চ্যাটার্জী লেন, কলি-৫

প্রচ্ছদ : সহদেব সাহা

স্নেহের

সবিতা, নমিতা, কবিতা

ও

অরবিন্দ, সুভাষকে

আমি এখন মুখোমুখি এক ভয়াবহ সমাজ-ব্যবস্থার। এখানে একদল মানুষ বাস করে অন্ধকার গহ্বরে আর একদল নিষ্কর্মা অলস কিন্তু সুন্দর মানুষকে পুষে রাখে ছাগল ভেড়ার মত খাদ্যের প্রয়োজনে! মানব সভ্যতার এই ভয়াবহ পরিণতির বীজ বোধহয় বোনা হয়েছিল আমাদেরই কালে। আমি টাইম মেশিনে চেপে এই কল্পনাতীত দূর ভবিষ্যতকে অবলোকন করছি। সাক্ষী হয়ে রয়েছি পৃথিবীর শেষ দৃশ্যের ··

এক

সময়-পর্যটক তখন একটা রহস্যময় ব্যাপার ব্যাখ্যা করছিলেন। ওঁর ধূসর চোখদুটো উত্তেজনায় চকচক করছিল। ফ্যাকাশে মুখটা আগুনের আভায় লালচে দেখাচ্ছিল। ফায়ার-প্লেসের ভিতরটা উস্কে দেওয়াতে ছাইমুক্ত আগুনের স্নিগ্ধ-আভা রূপোর লিলি ফুলগুলোর উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চশমার কাচের উপর দুলছিল। ঘরের চেয়ারগুলো যেন গভীর আদরে আমাদের কোল পেতে দিয়েছিল। তাই আমরা কেউই সেই চেয়ারগুলোয় সোজা হয়ে বসতে পারছিলাম না। সবাই আধ-শোয়া হয়ে চেয়ারগুলোয় গা এলিয়ে দিয়েছিলাম। রাতের খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সেই আরামদায়ক ও বিলাসবহুল আবহাওয়া মনের চিন্তাভাবনাগুলোকে আপনা থেকেই আবেশমণ্ডিত করে তুলছিল। আমরা আলস্যে গা এলিয়ে দিয়ে সময়-পর্যটকের আপাতবিরুদ্ধ ব্যাপার নিয়ে মাতামাতিটা বেশ উপভোগ করছিলাম।

'আশা করি আমার কথাগুলো আপনারা খুব মন দিয়ে শুনছেন। এবার সর্বজন স্বীকৃত দু'একটা মতবাদ সম্বন্ধে আমাকে হয়ত কিছু বিতর্কমূলক কথা বলতে হবে।, আপনারা স্কুলে যে জ্যামিতি শিখেছেন, তা কতকগুলো ভুল ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে। বললেন সময়-পর্যটক।

'এরকম লম্বা-চওড়া কথা বলা কি ঠিক হচ্ছে?' লাল-চুলো ফীলবি মন্তব্য করল। ফোড়ং কাটা ফীলবির একটা বদ অভ্যাস।

'আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হলে, আপনাদের নিশ্চয় বিশ্বাস করতে বলব না। আপনারা

হয়ত জানেন যে গাণিতিক সরলরেখা বা সমতলভূমির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এগুলো হল মানসিক ধারণা।'

'তা না হয় হল', বললেন মনস্তত্ত্ববিদ।

'তেমনি কেবল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা থাকলেই কি একটা ঘন-বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায়?'

সময়-পর্যটকের কথা শেষ হতেই ফীলবি বলে উঠল, 'আপনার একথা আমি মানতে পারছি না। একটা শক্ত ঘন বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নিশ্চয় আছে। আপনার চারপাশে তাকালেই— ।'

ফীলবির কথা শেষ হওয়ার আগেই সময়-পর্যটক বলে উঠলেন, 'বেশীরভাগ লোকই অবশ্য সেইরকম মনে করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখবেন কোন ঘন বা শক্ত বস্তুর অস্তিত্ব সময়ের উপরে নির্ভরশীল।,

কথাটা ফীলবি ভালভাবে বুঝতে পারল না। ওর মুখটা কালো হয়ে উঠল। কোন রকমে ও বলল, 'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।'

'এমন কোন ঘন বস্তুর অস্তিত্ব কি আপনি কল্পনা করতে পারেন, যা সময়ের সূক্ষ্মতম ক্ষণ-মুহূর্তেও স্থায়ী হয় না?' সময়-পর্যটক একটু থেমে সবার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আবার শুরু করলেন, 'তাই যে-কোন বস্তুরই চারটে মাত্রা থাকা দরকার। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও সময়। প্রথম তিনটেকে বলি আমরা অবস্থানিক মাত্রা, আর চার নম্বর মাত্রার নাম হচ্ছে সময়-মাত্রা। সময় যদিও একটা মাত্রা, তবু প্রথম তিনটে মাত্রার সঙ্গে এর একটা অবাস্তব পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা সব সময় হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ হয়তো এই যে আমাদের মন সময়ের সঙ্গে ধাপে ধাপে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত, বিরামহীন ভাবে।'

একজন তরুণ বাতির আগুনে চুরুট ধরাতে ধরাতে বলে উঠল, 'ব্যাপারটা বেশ সহজভাবেই বুঝিয়েছেন আপনি।'

সময়-পর্যটক একটু খুশী হয়ে আবার শুরু করলেন, 'সময় হচ্ছে চতুর্থ মাত্রা, অথচ দেখুন কী আশ্চর্যভাবে আমরা সেই প্রয়োজনীয়

মাত্রাটার কথা বেমালুম ভুলে যাই। আসলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে সময়-মাত্রার কোন তফাৎ নেই। কিছু পাগল মানুষ কিন্তু চতুর্থ মাত্রাকে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। চতুর্থ মাত্রা সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তা-ভাবনার কথা আপনারা নিশ্চয় শুনে থাকবেন।'

'না, আমি সেরকম কিছু শুনিনি।' জানালেন মেয়র। 'ব্যাপারটা কঠিন কিছু নয়। গণিতজ্ঞরা যাকে স্পেস বা স্থান বলেন তার তিনটে মাত্রা আছে—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। প্রত্যেক মাত্রা অন্য মাত্রার সঙ্গে ৯০° কোণে যুক্ত। কিন্তু একদিন কিছু পাগল মানুষের মনে প্রশ্ন জাগল মাত্র তিনটে মাত্রার কথা কেন ভাবা হয়? তিনটের বেশী চারটে মাত্রা কি থাকতে পারে না? নিশ্চয় থাকতে পারে—এবং সময়ই হচ্ছে সেই চতুর্থ মাত্রা। এই চতুর্থ মাত্রাও ৯০° কোণে অন্য মাত্রার সঙ্গে যুক্ত। এই ধারণার উপর নির্ভর করে তাঁরা চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি খাড়া করার চেষ্টা করেছেন। মাসখানেক আগে অধ্যাপক সাইমন নিউকম্ব নিউইয়র্ক ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে এই চতুর্মাত্রিক জ্যামিতির ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আপনারা জানেন যে, আমরা দ্বিমাত্রিক কাগজের উপর ত্রিমাত্রিক কোন জিনিসের ছবি আঁকতে পারি। এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ঠিক সেইভাবে ত্রিমাত্রিক মডেলের সাহায্যে তাঁরা চতুর্মাত্রিক জিনিসের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন আশা করি।'

'বোধহয়', বিড়বিড় করে বললেন মেয়র। দু'চোখ বন্ধ করে ঠোঁটদুটো এমনভাবে নাড়তে লাগলেন উনি যে দেখে মনে হল উনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছেন। মন্ত্রোচ্চারণের মত বলে গেলেন উনি, 'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন, ব্যাপারটা আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি।'

সময়-পর্যটক আবার বলতে আরম্ভ করলেন, 'যাহোক, এখন আর আপনাদের বলতে বাধা নেই, আমিও বেশ কিছুদিন ধরে এই চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি নিয়ে গবেষণা করেছি। অদ্ভুত সব ফলাফল পেয়েছি।

একটা খুব সাধারণ উদাহরণ দেখুন। একই মানুষের বিভিন্ন বয়সের কতকগুলো ছবি। এই ছবিটা আট বছর বয়সের, এটা পনের বছরের, এর পরেরটা সতেরো বছরের। এসবই লোকটির চতুর্মাত্রিক অস্তিত্বের ত্রিমাত্রিক প্রকাশ।' একটু থেমে উনি আবার শুরু করলেন, 'এই দেখুন একটা আবহাওয়া রেখাচিত্র। এই যে রেখাটি দেখছেন এটা হচ্ছে ব্যারোমীটারের রীডিং। গতকাল সকালে এটা এইখানে ছিল, গতকাল রাতে আবার নেমে এসেছিল এখানে। আবার আজ সকালে এটা উঠতে শুরু করেছে। ব্যারোমীটারের পারা যে রেখা-চিত্র আঁকছে তা সময়-মাত্রায় একথা আমরা বলতে পারি।'

ডাক্তারবাবু ফায়ার-প্লেসের জ্বলন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু সত্যিই যদি সময় একটা মাত্রা হয় তাহলে এটাকে সব সময় উপেক্ষা করা হয় কেন? আর কেনই বা তাহলে আমরা অন্য মাত্রার মধ্যে যেভাবে সহজে ঘুরে বেড়াতে পারি, সেভাবে এই চতুর্থ মাত্রা অর্থাৎ সময়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারি না?'

সময়-পর্যটক একটু হাসলেন। তারপর ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি বিশ্বাস অন্যান্য তিনটে মাত্রায় আমরা খুব সহজে ঘুরে বেড়াতে পারি? হ্যাঁ, ডানদিকে, বাঁদিকে আমরা চলতে পারি। সামনে পিছনে চলাও অসম্ভব নয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এই দুটো মাত্রার মধ্যে মানুষ খুব সহজে চলাফেরা করতে পারে একথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু উপর-নীচে চলাফেরার ব্যাপারটা? সেখানে মাধ্যাকর্ষণ একটা বাধা।'

'কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। বেলুনের সাহায্যে সে বাধাকে খুব সহজে অতিক্রম করা যায়।' জবাব দিলেন ডাক্তারবাবু।

'কিন্তু বেলুন আবিষ্কারের আগে সামান্য লাফ দেওয়া ছাড়া মানুষ সহজভাবে এই তৃতীয় মাত্রায় চলাফেরা করতে পারেনি।'

'মই বা সিঁড়ি বেয়ে উপর-নীচে চলাফেরা করেছে বৈকি।' ডাক্তার-বাবুটি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন।

'উপরে চড়ার চেয়ে নীচে পড়া অবশ্য অনেক সহজ…', কে যেন মন্তব্য করল।

'কিন্তু সময়ের মধ্যে কেউ এতটুকু নড়াচড়া করতে পারে না। বর্তমান মুহূর্ত থেকে একচুল নড়বার কারো কোন ক্ষমতা নেই।' বললেন ডাক্তারবাবু।

'প্রিয় মহাশয়! এখানেই আপনি ভুল করছেন। অবশ্য আপনার কোন দোষ নেই, সারা পৃথিবীর লোক এই একই ভুল করে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে আমরা বর্তমান থেকে সরে ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছি। আমাদের মনের কিন্তু কোন মাত্রা নেই, আর সেই মাত্রাহীন মন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের গতির সঙ্গে একই তালে সময়-মাত্রা ধরে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের পঞ্চাশ মাইল উপর থেকে লাফ দিলে যেভাবে আমরা মাটির দিকে নেমে আসতাম ঠিক সেইভাবে আমরা সময়ের গতির সঙ্গে একই তালে ছুটে চলেছি।'

'কিন্তু সব থেকে মুস্কিলের কথা কি জানেন?' সময়-পর্যটককে বাধা দিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ বলতে আরম্ভ করলেন, 'অন্য মাত্রার মধ্যে যেদিকে খুশী আপনি চলাফেরা করতে পারেন, কিন্তু সময় মাত্রার মধ্যে তা অসম্ভব।'

'আপনার কথা আমি ঠিক মানতে পারলাম না', বললেন সময়-পর্যটক। 'মনে করুন আমি যদি একটা পুরোনো ঘটনা খুব গভীর-ভাবে ভাবতে শুরু করি তাহলে ঘটনাটি যখন ঘটেছিল সেই সময়ে আমার মনকে নিয়ে যেতে পারি। মনে হবে আমি যেন সেই অতীতের ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করছি। ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে আমি তথা-কথিত বর্তমান থেকে সরে যাব। বর্তমানে যা ঘটছে সে সম্পর্কে আমি সজাগ থাকব না। তাহলে আমি কি সময়-মাত্রার মধ্যে খুশীমত চলাফেরা করছি না? তবে সেই অতীতে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের পক্ষে সাধারণভাবে সম্ভব নয়। মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে মানুষ যখন বেলুনের সাহায্যে তৃতীয় মাত্রায় ঘুরতে পারে তাহলে অন্য কোন

কৃত্রিম উপায়ে সে চতুর্থ মাত্রার মধ্যেই বা ঘুরতে পারবে না কেন ?'

ফীলবি বলে উঠল, 'এসব আজগুবী ব্যাপার কখনো সম্ভব ?'

'কেন সম্ভব নয় বলুন ?' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সময়-পর্যটক।

'ব্যাপারটা যুক্তি-বিরুদ্ধ।' জবাব দিল ফীলবি।

'কেন যুক্তি-বিরুদ্ধ ?' প্রশ্ন করলেন সময়-পর্যটক।

'আপনি তর্ক করে কালোকে সাদা প্রমাণ করতে পারেন, কিন্তু ব্যাপারটা কখনো আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না।' সময়-পর্যটক একটু হেসে বললেন, 'তা ঠিক। তবে এতক্ষণে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কেন আমি চতুর্মাত্রিক জ্যামিতি নিয়ে গবেষণা চালিয়েছি। বহুদিন থেকেই একটা যন্ত্রের অস্পষ্ট ছায়া আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল···।'

'সময়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার যন্ত্র বুঝি ?' তরুণটি বেশ উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, কাল-যন্ত্র, যা তার চালকের নির্দেশে সময়-মাত্রার যে কোন দিকে চলাফেরা করতে পারবে।'

ফীলবি হাসি চাপবার চেষ্টা করল।

সময়-পর্যটক এবার জোরের সঙ্গে বললেন, 'হাসবেন না, গবেষণার ফলাফল আমার হাতেই আছে।'

মনস্তত্ত্ববিদ একটু হেসে বললেন, 'ঐতিহাসিকদের কাছে জিনিসটা খুবই আকর্ষণীয় হবে। তাঁরা নিজেরাই অতীতে গিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। হেস্টিংসের যুদ্ধটা হয়ত স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।'

এতক্ষণে ডাক্তারবাবু মুখ খুললেন, 'আপনার কি মনে হয় ঐতিহাসিকরা তাঁদের নজরে পড়ে যাবেন ? আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের খুব একটা সুনজরে দেখবেন বলে আমার কিন্তু মনে হয় না।'

তরুণটি উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'কেউ যদি হোমার ও প্লেটোর নিজের মুখের কথা শুনতে চায়, তাহলে সে তা শুনতে পারে?' 'সে ক্ষেত্রে তাঁরাও হয়ত আমাদের পরীক্ষা করে দেখবেন গ্রীক ভাষা আমরা কেমন বলতে পারি। অবশ্য জার্মান পণ্ডিতরা গ্রীক ভাষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছেন।' মন্তব্য করল ফীলবি।

'তার উপরে রয়েছে ভবিষ্যতে যাওয়ার ব্যবস্থা,' বলে উঠল তরুণটি, 'ভাবতে পারেন? কেউ বর্তমানে ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রেখে কাল-যন্ত্রে চেপে ভবিষ্যতে পাড়ি দিল। মুহূর্তের মধ্যে হয়ত পঁচিশ বছরের সুদ সমেত আসল টাকা উঠিয়ে নিয়ে আবার বর্তমানে চলে এল।'

'কমুউনিজম এর উপর গড়ে ওঠা কোন সমাজব্যবস্থাও হয়ত আবিষ্কার করা সম্ভব হবে।' এতক্ষণে আমি কথা বললাম।

মনস্তত্ত্ববিদ এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এইসব আজগুবী তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে মন্দ লাগে না, কিন্তু যতক্ষণ না...।'

'যতক্ষণ না আপনি প্রমাণ পাচ্ছেন ততক্ষণ আপনি বিশ্বাস করবেন না এই তো? কিন্তু আপনি কি সত্যি সত্যি প্রমাণগুলো পরীক্ষা করে দেখতে চান? প্রশ্ন করলাম আমি।

'পরীক্ষা?' ফীলবি চেঁচিয়ে উঠল, 'কার অত মাথাব্যাথা হয়েছে মশাই!' মনস্তত্ত্ববিদ বললেন, 'আপনার পরীক্ষার ফলাফল আমাদের দেখাতে পারেন, যদিও এসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার এতটুকু ইচ্ছে আমার নেই।'

আমাদের সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সময়-পর্যটক একটু হেসে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে ওঁর গবেষণাগারের দিকে চলে গেলেন। ওঁর চটির শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

মনস্তত্ত্ববিদ আমাদের সবায়ের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর যেন স্বগোতক্তি করার মত ফিসফিস করে বললেন, 'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, কী এমন উনি আবিষ্কার করেছেন?'

'কোন ম্যাজিক ট্যাজিক হবে—হাত সাফায়ের খেলা।' গম্ভীরমুখে মন্তব্য করলেন ডাক্তারবাবু।

ফীলবি বার্সলেমে এইরকম একজন ভেল্কীবাজকে দেখেছিল। তারই গল্প শুরু করল ও। কিন্তু গল্পের ভূমিকা শেষ হওয়ার আগেই সময়-পর্যটক ফিরে এলেন। ফীলবির গল্প মাঝপথেই থেমে গেল।

সময়-পর্যটকের হাতে একটা উজ্জ্বল ধাতব যন্ত্র। একটা ছোট্ট দেওয়াল ঘড়ির থেকে বড় নয় ওটা। জিনিসটা খুব যত্ন করে তৈরী বলে মনে হল। গজদন্তের কাজ করা ছিল উপরে, আর ভিতরে কিছু স্বচ্ছ স্ফটিকের মত জিনিস ছিল বলে মনে হচ্ছিল। সময়-পর্যটক একটা ছোট আট-কোণা টেবিল টেনে নিয়ে এসে ফায়ার-প্লেসের সামনে রাখলেন। তারপর টেবিলের উপর হাতের সেই অদ্ভুত যন্ত্রটা রেখে একটা চেয়ার টেনে টেবিলটার সামনে বসে পড়লেন। টেবিলটার উপর একটা ঢাকা লাগানো আলো ছিল, তা থেকে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছিল যন্ত্রটার উপর। ঘরের মধ্যে অবশ্য আরো ডজন খানেক বাতি জ্বলছিল। সারা ঘর ভরে ছিল আলোয়। আমি এতক্ষণ ফায়ার-প্লেসের কাছে একটা নীচু আরাম কেদারায় বসে ছিলাম। আমি আরাম-কেদারাটা একটু টেবিলটার দিকে টেনে নিলাম। ফীলবি বসেছিল আমার পিছনের দিকটায়। ডাক্তারবাবু ও মেয়র ডানদিক থেকে সময়-পর্যটককে লক্ষ করছিলেন। বাঁ দিকে ছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ। আর মনস্তত্ত্ববিদের পিছনে ছিল তরুণটি। আমরা সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে সময়-পর্যটকের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এই পরিবেশে ভেল্কী দেখিয়ে উনি যে আমাদের চোখে ধূলো দিতে পারবেন না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

সময়-পর্যটক একবার আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালেন, তারপর চোখ নামিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন যন্ত্রটাকে।

'বেশ, এবার তাহলে আরম্ভ করুন।' ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে মনস্তত্ত্ববিদ প্রথম কথা বললেন।

সময়-পর্যটক টেবিলের উপর দুহাতের কনুই রেখে দুহাত ঘষতে

ঘষতে বললেন, 'এই ছোট্ট যন্ত্রটি হচ্ছে আসল যন্ত্রের মডেল। কাল-যন্ত্রের নমুনা বলতে পারেন। আপনারা এতক্ষণে হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, আমার এই যন্ত্রটা দেখতে একটু অদ্ভুত। এর রঙটা এমন যে দেখে মনে হবে যেন যন্ত্রটার কোন অস্তিত্বই নেই।' উনি যন্ত্রটার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'দেখুন, এখানে একটা সাদা লীভার রয়েছে আর এপাশে আর একটা লীভার আছে।'

ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন। 'জিনিসটা দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর।' বললেন উনি।

'এটা তৈরী করতে আমার দু'দুটো বছর সময় লেগেছে।' বললেন সময়-পর্যটক। এরপর আমরা সবাই যখন কৌতূহল দমন করতে না পেরে ডাক্তারবাবুর মত চেয়ার ছেড়ে উঠে জিনিসটা ভালভাবে দেখতে লাগলাম, তখন উনি আবার বলতে লাগলেন, 'এবার দেখুন এই লীভার-টায় চাপ দিলে যন্ত্রটা ভবিষ্যতে চলে যাবে, আর এই পাশের লীভারটায় চাপ দিলে যন্ত্রটা উল্টোমুখো অর্থাৎ অতীতের দিকে চলতে সুরু করবে। এই জায়গাটি হচ্ছে চালকের আসন। আমি এবার এই লীভারটায় চাপ দিচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটা সচল হয়ে উঠবে ও অদৃশ্য হয়ে যাবে। ভবি-ষ্যতের বুকে পাড়ি জমাবে ওটা। ভাল করে লক্ষ্য করুন। টেবিলটার দিকে নজর রাখুন। দেখুন আমি কোন ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছি কিনা। পরে আপনারা আমাকে ভেল্কীবাজ বলবেন তা আমি শুনতে চাই না।'

ঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। মনস্তত্ত্ববিদ আমাকে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। সময়-পর্যটক লীভারটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন, তারপর হঠাৎই বলে উঠলেন, 'না, আপনাদের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসুন।' বলেই মনস্তত্ত্ববিদের দিকে ফিরে ওঁর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তর্জনীটা বাড়িয়ে দিতে বললেন। মনস্তত্ত্ববিদ লীভারটায় চাপ দিলেন তা আমরা সবাই দেখতে পেলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্যে কোন যাদুকরের ছল-চাতুরী ছিল না। লীভারটায়

চাপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর লাফিয়ে পড়ল এক টুকরো ছোট্ট দমকা হাওয়া। আলোর শিখাটা লাফিয়ে উঠল। ঘরের একটা বাতি নিভে গেল। ছোট্ট কাল-যন্ত্রটা যেন দুলে উঠল। তারপর দ্রুত ওটা অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। মুহূর্তের জন্যে পিতল আর গজদন্তের উপর প্রতিফলিত আলোর মধ্যে যেন একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি হল, আর তারপরই সেই ছোট্ট কাল-যন্ত্রের নমুনাটা ভৌতিক অপচ্ছায়ার মত যেন মিলিয়ে গেল। আটকোণা টেবিলটার উপর সেই ঢাকা দেওয়া আলোটা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই।

কয়েক মুহূর্ত আমরা সবাই যেন নিশ্চল হয়ে পড়লাম। ফীলবি হঠাৎ বলে উঠল যে, সে অসুস্থবোধ করছে।

মনস্তত্ত্ববিদ ওঁর মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেতেই টেবিলের নীচে উঁকি মারলেন। মনস্তত্ত্ববিদের কাণ্ড দেখে সময়-পর্যটক হেসে ফেললেন। 'দেখুন, দেখুন, ভাল করে খুঁজে দেখুন।' মনস্তত্ত্ববিদকে উদ্দেশ্য করে বললেও মনে হল কথাটা উনি আমাদের সব্বাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন। মনেমনে ওঁর বিজয়ীর গর্ব। চেয়ার ছেড়ে উঠে তামাকের জার থেকে তামাক নিয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে একমনে পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন উনি।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। ডাক্তারবাবু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কি মাথা ঘামাচ্ছেন? আপনারা সত্যি সত্যি কি বিশ্বাস করেন যে যন্ত্রটা ভবিষ্যতের বুকে পাড়ি জমিয়েছে?'

'নিশ্চয়!' বলে পাইপে আগুন ধরিয়ে আমাদের দিকে ফিরে মনস্তত্ত্ব-বিদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মনস্তত্ত্ববিদ একটা চুরুট ধরাবার চেষ্টা করে বোঝাতে চাইলেন যে উনি ঠিক আছেন। 'তার থেকেও বড় কথা আমি একটা আসল কাল-যন্ত্র প্রায় শেষ করে এনেছি।' উনি হাত বাড়িয়ে ওঁর গবেষণাগারের দিকটা দেখালেন। 'ওটা শেষ হলে আমি নিজেই সময়-পর্যটনে বেরুবো।' 'আপনি বলতে

চাইছেন যে ওই ছোট্ট ভূতুড়ে যন্ত্রটা ভবিষ্যতে পাড়ি জমিয়েছে?' প্রশ্ন করল ফীলবি।

'ভবিষ্যতে কি অতীতে তা আপনাকে সঠিক বলতে পারব না,' বলে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন সময়-পর্যটক।

কিছুক্ষণ বাদে মনস্তত্ত্ববিদ যেন কিছুটা মনের জোর ফিরে পেলেন। উনি বলে উঠলেন, 'ওটা যদি আদৌ কোথাও গিয়ে থাকে তাহলে অতীতে গেছে।'

'কেন? অতীতে কেন?' সময়-পর্যটক জানতে চাইলেন।

'তার কারণ ওটা যদি ভবিষ্যতে যেত তাহলে ওটাকে আমরা টেবিলের উপরেই দেখতে পেতাম, কারণ আমরাও তো ক্রমাগত বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।' আমি একটু ভেবে বললাম, 'কিন্তু ওটা যদি অতীতেই গিয়ে থাকে তাহলে আমরা যখন এই ঘরে প্রথম ঢুকেছিলাম তখনই তো ওটাকে দেখতে পেতাম। কিম্বা গত বৃহস্পতিবার যখন আমরা এঘরে জমায়েত হয়েছিলাম তখন দেখতে পেতাম। বা তার আগের বৃহস্পতিবারগুলোয় যন্ত্রটা নিশ্চয় আমাদের চোখে পড়ত—তাই নয় কি?'

'আপনার কথায় আমি ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছি,' বললেন মেয়র।

মনস্তত্ত্ববিদের দিকে ফিরে সময়-পর্যটক জানতে চাইলেন, 'আপনি কি মনে করেন ব্যাপারটা আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন?'

'নিশ্চয়!' বললেন মনস্তত্ত্ববিদ। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ব্যাপারটা জলের মত সোজা। ব্যাপারটা মোটেও জটিল নয়, আমার আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। এর মধ্যে কোন আপাতবিরোধ নেই বলেই আমার ধারণা। আপনার যন্ত্রটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। একটা ঘুরন্ত সাইকেলের চাকার স্পোকগুলো আমরা দেখতে পাই না। বাতাসের ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাওয়া বুলেটকেও আমরা দেখতে পাই না। অর্থাৎ কোন জিনিস যদি প্রচণ্ড গতিতে ছোটে তাহলে আমরা তাকে নাও দেখতে পারি। ব্যাপারটা খুবই সহজ। দেখুন সত্যি কিনা?'

মিনিটখানেক ধরে বসে বসে আমরা সেই শূন্য টেবিলটা লক্ষ্য করলাম। এরপর সময়-পর্যটক আমাদের মনোভাব একে একে ব্যক্ত করতে অনুরোধ জানালেন।

'আজ রাতে ব্যাপারটা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু সকাল হতে দিন।' বললেন ডাক্তারবাবু।

'আপনারা কি আসল কাল-যন্ত্রটিকে দেখতে চান?' বলে আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করেই উনি বাতিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দীর্ঘ বারান্দা পেরিয়ে গবেষণাগারের দিকে চলতে শুরু করলেন। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে, বাতির সেই কম্পিত আলো, সময়-পর্যটকের মাথার উপর আলো-ছায়ার খেলা এবং কিভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত ওঁকে আমরা অনুসরণ করেছিলাম। তারপর গবেষণাগারে ঢুকে একটা বিরাট কালযন্ত্র দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের চোখের সামনে যে ছোট্ট যন্ত্রটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, এটি তারই বড় সংস্করণ। এর কিছু অংশ নিকেলের, কিছু গজদন্তের, কিছু স্ফটিকের। কিছু কিছু অংশ তখনো চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পাশে পড়েছিল কতকগুলো খোলা নক্সা। আমি ভাল করে পরীক্ষার জন্য একটা যন্ত্রাংশ তুলে নিলাম। জিনিসটা স্ফটিকের বলে মনে হল।'

ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'দেখুন মশায় এসব কি আপনি সত্যি সত্যি দেখাচ্ছেন? নাকি গতবারের বড়দিনে দেখানো ভূতের মত এও কোন ম্যাজিক ট্যাজিক?'

সময়-পর্যটক বললেন, 'এই কালযন্ত্রে চেপে আমি কাল সমুদ্র পাড়ি দিতে চাই। আমি আপনাদের সঙ্গে একটুও ঠাট্টা করছি না, বুঝেছেন?'

ব্যাপারটা কেউই আমরা হজম করতে পারছিলাম না।

আমি ফীলবির দিকে তাকাতেই ও চোখ মটকালো।

দুই

আমার মনে হয় সে সময় আমরা কেউই 'কাল-যন্ত্র' বলে কিছুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। তার কারণ সময়-পর্যটক এমনই একজন মানুষ যাঁকে সহজে বিশ্বাস করা খুব মুস্কিল, বোঝা আরো অসম্ভব ব্যাপার। সবকিছু জানার পরও একটা সন্দেহের পাতলা ছায়া মনের মধ্যে ভেসে বেড়াবেই। যদি ফীলবি যন্ত্রটা দেখাতো আর সময়-পর্যটকের ভাষায় আমাদের সবকিছু ব্যাখ্যা করে শোনাতো তা-হলে আমরা হয়ত ফীলবির কথায় সন্দেহ করতাম না। কারণ ওর উদ্দেশ্য বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু এই সময়-পর্যটকের চরিত্রের মধ্যে এমন একটা খামখেয়ালীপনা লুকোনো ছিল যে লোকটাকে কখনই আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করে উঠতে পারতাম না। তাই আমার মনে হয় সেই বৃহস্পতিবার থেকে পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কেউ সময়ের স্রোতে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন। যদিও এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আমাদের সবার মনের উপর বেশ গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কাল-যন্ত্রের ছোট নমুনাটা অন্ততঃ আমাকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরের শুক্রবার ব্যাপারটা নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। উনি বলেছিলেন যে ঠিক এই ধরনের একটা ব্যাপার দেখেছিলেন উনি টিউবিনগেনে। কিন্তু ব্যাপারটা কি করে ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা উনি জানেন না।

পরের বৃহস্পতিবারে আমি আবার রিচমণ্ডে গেলাম। আমার মনে হয় আমি সময়-পর্যটকের একজন নিয়মিত অতিথি। আমার যেতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। পৌঁছে দেখলাম আমার আগে চার পাঁচজন লোক ওঁর বসবার ঘরে জড়ো হয়েছেন। ডাক্তারবাবু ফায়ার-প্লেসের

সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁর এক হাতে এক টুকরো কাগজ ও অন্য হাতে ঘড়ি। আমি সময়-পর্যটকের জন্য এদিক ওদিক তাকালাম।—'এখন সাড়ে সাতটা', ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় খাওয়া-দাওয়ার পার্টটা চুকিয়ে ফেলা যেতে পারে।'

'উনি কোথায় ?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনি এক্ষুণি এলেন বুঝি ? অনিবার্য কারণে ওঁর দেরী হচ্ছে। উনি এই কাগজটায় লিখে রেখে গেছেন, সাতটার মধ্যে উনি যদি না এসে পৌঁছোন তাহলে আমরা যেন ডিনারটা শেষ করে ফেলি। উনি ফিরে এসে আমাদের সব বুঝিয়ে বলবেন।'

'তা ঠিক ডিনারটা নষ্ট করার কোন মানে হয় না', বললেন এক বিখ্যাত দৈনিক কাগজের সম্পাদক। ডাক্তারবাবু এরপর ডিনারের ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

আমি ও ডাক্তারবাবু ছাড়া আর ছিলেন মনস্তত্ত্ববিদ, যিনি আগের দিনের ডিনারে উপস্থিত ছিলেন। নতুনদের মধ্যে ছিলেন ব্ল্যাঙ্ক, আগের উল্লিখিত কাগজের সম্পাদক, জনৈক সাংবাদিক, একজন দাড়িওলা শান্ত ও লাজুক মানুষ যাকে আমি আগে কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। আজকের আলোচনায় উনি একবারও অংশ নেন নি, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সময়-পর্যটকের এই অস্বাভাবিক অনুপস্থিতি নিয়ে ডিনার টেবিলে আমরা নানারকম জল্পনা-কল্পনা করলাম। সময় পর্যটন সম্বন্ধে আমি একটু হাসি ঠাট্টা করলাম। সম্পাদক মশায় পুরো ব্যাপারটা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে মনস্তত্ত্ববিদ গত সপ্তাহের সেই অদ্ভুত ঘটনা বলতে শুরু করলেন। উনি যখন বেশ খানিকটা এগিয়েছেন ঠিক তখুনি বারান্দার দিকের দরজাটা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে খুলে গেল। আমি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম তাই ব্যাপারটা সবার আগে আমার নজরে পড়ল।

'হ্যালো!' আমি বলে উঠলাম, 'অবশেষে এলেন তাহলে।'

দরজাটা পুরোপুরি খুলে গেল। দরজার সামনে সময়-পর্যটক দাঁড়িয়ে।

'হে ভগবান! একি অবস্থা! কি হয়েছে মশাই?' ডাক্তারবাবু তো প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। টেবিলের সবাই চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালেন।

ওকি চেহারা হয়েছে ওঁর! কোটটা ধূলো-কাদা লাগা, নোংরা, হাতা দুটোতে সবুজ রঙের চটচটে কি যেন লেগে রয়েছে। উস্কোখুস্কো চুল। যেন বেশী সাদাটে দেখাচ্ছে, তা ধূলোবালির জন্যও হতে পারে অথবা সত্যি সত্যি পাক ধরার জন্যও হতে পারে। মুখটা শুকনো ও মড়ার মত ফ্যাকাশে। থুতনীটা কাটা, লাল হয়ে রয়েছে। সমস্ত চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটা চরম দৈন্যদশা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য উনি ইতস্তত করলেন, যেন ঘরের আলোয় ওঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উনি ঘরে ঢুকলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, উনি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। আমরা সবাই নিঃশব্দে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম ওঁর কথা শোনার জন্য।

উনি কোন কথা না বলে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর মদের বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন। সম্পাদক মশাই তাড়াতাড়ি এক গ্লাস শ্যাম্পেন ভর্তি করে ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। উনি শ্যাম্পেনটুকু প্রায় এক চুমুকে খেয়ে নিলেন। মনে হল এতক্ষণে উনি যেন একটু সুস্থ বোধ করছেন। কারণ উনি টেবিলের চারপাশে সবাইয়ের মুখের দিকে ধীরে ধীরে তাকালেন। ওঁর নিজস্ব হাসিটা আস্তে আস্তে ওঁর মুখে ফিরে আসছে বলে মনে হল। সম্পাদক মশাই ওঁর শ্যাম্পেনের গ্লাসটি আবার ভর্তি করে দিলেন।

'কোথায় গিয়েছিলেন মশায়?' ডাক্তারবাবু ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মনে হল সময়-পর্যটক ডাক্তারবাবুর কথা শুনতে পাননি।

'আপনাদের বিরক্ত করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। আমি ভালই

আছি।' বলে শ্যাম্পেনের গ্লাসটা মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরলেন। এক ঢোকে সবটা গলায় ঢেলে বললেন, 'জিনিসটা বেশ ভাল।' ওঁর চোখদুটো আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। গালে সামান্য রঙের আভা দেখা দিল। আমাদের সবার মুখের দিকে একে একে তাকালেন। সবাইকে যে ভালভাবে চিনতে পারলেন তা মনে হল না। তারপর সারা ঘরে চোখ বুলোলেন উনি।

'হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টে আসি। তারপর আপনাদের সব বুঝিয়ে বলব।···আমার জন্য দয়া করে কিছু খাবার রাখবেন। আমি খুব ক্ষুধার্ত।'

উনি সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে বললেন—'আশা করি ভাল আছেন।'

সম্পাদক মশায় ওঁকে প্রশ্ন শুরু করে দিলেন।

'আমাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাই না? এক্ষুণি সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলে উনি গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমি আবার ওঁর খুঁড়িয়ে চলা লক্ষ্য করলাম। ওঁর পা ফেলার নরম থপথপে শব্দ আমার কানে এলো। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ওঁর পা দেখতে পেলাম। পায়ে রক্তের দাগ লাগা একজোড়া ছেঁড়া মোজা ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওঁর পিছনে সিঁড়ির ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একবার মনে হল ওঁকে অনুসরণ করি, পর মুহূর্তে মনে হল উনি ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল দেখানো খুব একটা পছন্দ করেন না। আমার মনের মধ্যে হাজারো চিন্তার ভিড় জমে গেল। ঠিক তখনি সম্পাদক মশাইকে বলতে শুনলাম, 'বিখ্যাত বিজ্ঞানীর অদ্ভুত ব্যবহার।' কাগজের হেড-লাইনের কথা ভাবছেন বলে মনে হল আমার। ডিনার টেবিলের দিকে আবার আমি মনোযোগ দিলাম।

'ব্যাপারটা কি?' সাংবাদিক জানতে চাইলেন।—'উনি কি শখের

ফেরিওলা হয়েছেন ?—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। আমার মনে হচ্ছিল সময়-পর্যটক এখনো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। আমার মনে হল আমি ছাড়া আর কেউ ওর খুঁড়িয়ে চলাটা লক্ষ করেননি।

ডাক্তারবাবুই প্রথম এই অদ্ভুত অবস্থার ঘোর কাটিয়ে উঠে ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরদের কাউকে ডাকলেন একটা হট-প্লেট দেওয়ার জন্য। এরপর সম্পাদকমশাই ছুরি-কাঁটা তুলে নিলেন। সেই শান্ত লাজুক ভদ্রলোকটিও সম্পাদকমশাইকে অনুসরণ করলেন। ডিনার আবার শুরু হল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নানারকম কথাবার্তা হচ্ছিল। এক-সময় সম্পাদকমশায় কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলেন না। 'আমাদের বন্ধুটি কি তাঁর আয় বাড়াবার জন্য কোন অদ্ভুত পথ বেছে নিয়েছেন ?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাপারটা কাল-যন্ত্র সংক্রান্ত কিছু,' আমি বললাম। তারপর মনস্তত্ত্ববিদের বলা গত সপ্তাহের কথা উল্লেখ করলাম। নতুন অতিথিরা মোটেও ওসব কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। সম্পাদকমশায় বাধা দিলেন, 'সময়-পর্যটনের ব্যাপারটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।' তারপর খুব মজা করার ঢঙে বলতে লাগলেন, 'আপনাদের কি ধারণা যে ভবিষ্যতে কোট-ঝাড়া কোন বুরুশ টুরুশ নেই সেইজন্য ওঁকে ধূলোকাদা ভর্তি কোট পরে ফিরে আসতে হয়েছে ?' সাংবাদিকটিও এসব ব্যাপার বিশ্বাস করতে চাইলেন না। সম্পাদকমশায়ের সঙ্গে একযোগে সমস্ত ব্যাপারটা উনি প্রায় অসহনীয় করে তুললেন। নতুন যুগের সাংবাদিক এঁরা মজা করতে বেশী ভালবাসেন। যখন সাংবাদিকটি চেঁচিয়ে কিছু বলছিলেন, ঠিক তখুনি সময়-পর্যটক ঘরে ঢুকলেন, সাধারণ সান্ধ্য-পোষাক ওঁর পরণে।

সম্পাদকমশায় একটু ঠাট্টার সুরে বলে উঠলেন, 'এই ভদ্র-লোকরা বলছেন আপনি নাকি আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে বেড়িয়ে এলেন ? ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুন তো মশায়!

আর এই গল্পটার কী দাম আপনি ঠিক করছেন তাও একটু জানাবেন।'

'সময়-পর্যটক একটি কথাও না বলে ওঁর জন্যে নির্দিষ্ট আসনটায় এসে বসলেন। অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার খাবার কোথায়? আবার খেতে বসা কি সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

'গল্পটা বলুন', সম্পাদক মশায় তাড়া লাগালেন।

'চুলোয় যাক আপনার গল্প। আমি এখন কিছু খেতে চাই। খাওয়ার আগে আমি একটা কথাও বলব না। ধন্যবাদ! লবণটা একটু এগিয়ে দেবেন!'

'একটা কথা', প্রশ্ন করলাম আমি, 'আপনি কি সত্যি সময় পাড়ি দিচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।' উনি জবাব দিলেন। মুখে মাংস থাকার জন্য মাথা নাড়িয়ে উনি সম্মতি জানালেন।

'প্রতিটি লাইনের জন্য আমি আপনাকে এক শিলিং করে দেব।'

সম্পাদকমশায় উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন। সময়-পর্যটক ওঁর গ্লাসটা সেই শান্ত লাজুক ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে দিয়ে আঙুলের টোকা দিয়ে শব্দ করলেন। শান্ত ভদ্রলোকটি এতক্ষণ সময়-পর্যটকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। গ্লাসের শব্দে চমকে উঠে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করে ওঁর গ্লাসে মদ ঢেলে দিলেন। এরপর আর খাওয়া-দাওয়া খুব একটা জমল না। আমার জিভের ডগায় এক-গাদা প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল। অন্য সবার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক আমার মতঃ হচ্ছিল এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই অস্বস্তিকর পরিবেশকে একটু হাল্কা করার জন্য সাংবাদিকটি হেথী পটারের গল্প শুরু করে দিলেন। সময়-পর্যটক মনোযোগ দিয়ে খেতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু একটা সিগরেট ধরিয়ে আড়চোখে সময়-পর্যটককে দেখতে লাগলেন। সেই শান্ত ভদ্রলোকটি যেন আরো চুপচাপ হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয় নিজেকে ঠিক রাখার জন্য তিনি ঘন ঘন শ্যাম্পেনের

গ্লাস খালি করতে লাগলেন। অবশেষে একসময় সময়-পর্যটক খাওয়া শেষ করে প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালেন। 'আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। খিধের চোটে মারা যাচ্ছিলাম। আমি একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম।' সময়-পর্যটক কথা শেষ করে একটা চুরুট বের করলেন। 'আপনারা বরং পাশের ঘরে চলুন। বেশ লম্বা গল্প। এই এঁটো বাসনকোসন সামনে রেখে সে গল্প বলতে ভাল লাগবে না।' চাকরদের ডাকবার জন্য উনি ঘণ্টা বাজালেন। তারপর আমাদের সবাইকে পথ দেখিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

আরাম-কেদারায় বসতে বসতে আমাকে উদ্দেশ্য করে উনি প্রশ্ন করলেন, 'ব্ল্যাঙ্ক, ড্যাশ ও চোজকে কি কাল-যন্ত্রের কথা বলেছেন?' ওঁরা তিনজন যে আজকের নতুন অতিথি তা বুঝতে আমার অসুবিধে হল না। কিন্তু আমি কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সম্পাদকমশায় বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য নয়।'

'আজ আমি আপনাদের সঙ্গে তর্ক করতে পারব না। গল্পটা আপনারা যদি শুনতে চান বলতে পারি, কিন্তু কোন তর্কাতর্কি করা সম্ভব নয়।' উনি বলে চললেন, 'আমার কি ঘটেছিল তা শুনতে যদি আপনাদের আগ্রহ থাকে. আমি বলতে পারি, তবে দয়া করে কেউ আমাকে বলার সময় বাধা দেবেন না। আমি সত্যিই আপনাদের সব কিছু খুলে বলতে চাই। বেশীরভাগ কথা হয়ত বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না আপনাদের কাছে। তাই আপনাদের আগে থাকতে বলে রাখতে চাইছি। কিন্তু যা ঘটেছে এবং আমি যা বলতে যাচ্ছি—তা সত্যি—এর প্রতিটি অক্ষর সত্যি। ভোর চারটের সময় আমি আমার গবেষণাগারে গিয়েছিলাম, আর তারপর থেকে···আমি আটদিন বাস করেছি···কোন মানুষ কখনো এভাবে বাস করেনি! আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম। কিন্তু পুরো ঘটনা আপনাদের না বলে আমি ঘুমুতে যাব না। শেষ করে তবেই শুতে যাব। কিন্তু দয়া করে

কথার মাঝখানে কেউ আমাকে বাধা দেবেন না—কেমন?'

'ঠিক আছে', বললেন সম্পাদকমশায়। আমরা সবাই ওঁর কথার প্রতিধ্বনি তুললাম, 'ঠিক আছে, আপনার কথাই থাকবে।'

এরপর সময়-পর্যটক তাঁর গল্প শুরু করলেন। চেয়ারে আরাম করে বসে একজন বিধ্বস্ত লোকের মত কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তারপর কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে উনি চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। সে গল্প লিখতে বসে আমি বুঝতে পারছি কালি আর কলমের অসম্পূর্ণতার কথা। তাছাড়া গল্পের আসল রূপ বজায় রাখা আমার পক্ষে যে কি কষ্টকর ব্যাপার তাও বুঝতে পারলাম। আমার বিশ্বাস আপনারা খুব মন দিয়ে এ গল্প পড়বেন, তবু সেই স্বপ্নালোকিত ঘরে বক্তার ফ্যাকাশে মুখ আপনারা দেখতে পাবেন না: শুনতে পাবেন না তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক উত্থান-পতন। আপনারা জানতে পারবেন না কিভাবে গল্পের মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে বক্তার প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন ঘটছিল। আমরা বেশীরভাগ শ্রোতাই ছিলাম অন্ধকারে। শুধু সাংবাদিকের মুখ আর সেই শান্ত লাজুক ভদ্রলোকের হাঁটুর নিচের দিকের পা আলোকিত হয়েছিল। প্রথম দিকে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাতে ভুলে গিয়েছিলাম। সবাই একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম সময়-পর্যটকের মুখের দিকে।

তিন

'গত বৃহস্পতিবার আপনাদের কয়েকজনকে আমি কাল-যন্ত্রের মূল তত্ত্বের কথা বলেছিলাম ও অসমাপ্ত যন্ত্রটিকে দেখিয়েছিলাম। যন্ত্রটি এখনো সেই গবেষণাগারেই রয়েছে, তবে সময়-পর্যটনের জন্য একটু খারাপ অবস্থা ওটার। গজদন্তের একটা লাঠি একটু ভেঙে গেছে;

একটা পিতলের রেলিং বেঁকে গেছে। তাছাড়া আর সবকিছু অবশ্য ঠিকঠাকই আছে। ভেবেছিলাম গত শুক্রবারই অসম্পূর্ণ যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করে ফেলব। যখন প্রায় সবকিছু সম্পূর্ণ করে এনেছি তখন লক্ষ্য করলাম যে একটা নিকেলের নল প্রায় ইঞ্চিমত ছোট। ওটাকে আবার তৈরী করে নিতে হল। সুতরাং আজ সকালের আগে যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আজ সকাল দশটার সময় পৃথিবীর প্রথম কাল-যন্ত্র তার যাত্রা শুরু করেছিল। শেষবারের মত আমি ভাল করে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখলাম। স্ক্রু-ট্রু গুলো ভাল করে টাইট করে দিলাম। স্ফটিকের রডের উপর কয়েক ফোটা তেল ঢেলে দিলাম, তারপর নিজে উঠে চালকের আসনটিতে বসলাম। আত্মহত্যা করার আগে কোন লোক পিস্তলের নলটা কপালে ঠেকিয়ে পর মুহূর্তের কথা চিন্তা করে যেভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আমিও তেমনি রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। পর মুহূর্তে কী যে ঘটবে তার কিছুই জানি না। আমি একহাতে যন্ত্র চালু করার লীভারটা চেপে ধরলাম, অন্য হাতে চেপে ধরলাম যন্ত্রটা থামানোর লীভার। প্রথম লীভারটা চাপ দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় লীভারে চাপ দিলাম। মনে হল আমার মাথাটা ঘুরেউঠল। নিচে পড়ে যাওয়ার মত একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম গবেষণাগারের সবকিছু আমার চারিদিকে আগেকার অবস্থায় রয়েছে।'

সত্যিই কি কিছু ঘটেছে? মনে হল এটা আমার মনের ভুল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালাম। এক মুহূর্ত আগে দশটা বেজে এক মিনিট দেখেছিলাম বলে মনে হল, কিন্তু এখন প্রায় সাড়ে তিনটে!

'আমি বুক ভরে শ্বাস নিলাম, শক্ত করে দাঁতে দাঁত চাপলাম তারপর প্রথম লীভারটা শক্ত মুঠোয় ধরে জোরে চাপ দিলাম। গবেষণাগারটি প্রথমে ঝাপসা হয়ে এলো, তারপর অন্ধকারে ডুবে গেল। মিসেস ওয়াট্‌চেট ভিতরে এলেন, তারপর বাগানের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে হল উনি আমাকে দেখতে পাননি। এই জায়গাটুকু

পার হতে ওঁর মিনিটখানেক সময় হয়ত লেগেছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হল ভদ্রমহিলা যেন ঘর থেকে রকেটের মত বেরিয়ে গেলেন। আমি লীভারটায় চাপ দিয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে ঠেলে দিলাম। বাতি নিভিয়ে দিলে যেমন হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়, ঠিক তেমনি অন্ধকার রাত হঠাৎ নেমে এলো। আর পরমুহূর্তে সকাল হয়ে গেল, এসে গেল আগামী কাল'। আস্তে আস্তে আরো ঝাপসা হয়ে এলো। 'আগামী কাল' শেষ হয়ে গেল। নেমে এলো রাত। তারপর এলো আগামী পরশু' তারপর রাত, তারপর দিন···রাত···দিন···রাত···দিন···। খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগল। দূরাগত কোন মর্মর ধ্বনি আমার কানে আছড়ে পড়তে লাগল। আর আমার সারা মন ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে উঠল।'

'সে যে কী অদ্ভুত অনুভূতি তা আপনাদের আমি ঠিক বোঝাতে পারব না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর। মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে যন্ত্রটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। কালো বাদুড়ের ডানার মত রাত নেমে আসছিল দিনের শেষে। গবেষণাগারের অস্পষ্ট চিহ্নটুকুও আমার চারপাশ থেকে মুছে গিয়েছিলো। সূর্য লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশ পরিক্রমা করছিল। প্রতি লাফে একবার করে দিন হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল গবেষণাগারটি ধ্বংস হয়ে গেছে, আর আমি উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে পড়েছি। আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি কিছু একটা আঁকড়ে ধরে আছি ; কিন্তু আমি এত দ্রুত গতিতে ছুটছিলাম যে কোন চলন্ত জিনিস আমার কাছে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। সব থেকে ধীর গতি শামুক তখন আমার কাছে প্রচণ্ড গতিশীল বস্তু বলে মনে হচ্ছিল। আলো আর অন্ধকারের পরিবর্তনে আমার চোখের উপর ভীষণ মুহূর্মুহু চাপ পড়ছিল। সেই ক্ষণিক অন্ধকারের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম চাঁদ তার কক্ষ পথে দ্রুত ছুটছে। পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা হচ্ছে মুহূর্তে। মহাকাশে ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রদের ক্ষীণ আভাসও আমার চোখ এড়াল না। এরপর আমার কাল-যন্ত্র আরো দ্রুত চলতে শুরু করল। দিন আর

রাতের পার্থক্য সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে একটা ধূসর রঙ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। আকাশ আশ্চর্য নীল রঙ ধারণ করল। গোধূলীর আলোর মত এক অদ্ভুত উজ্জ্বল রঙ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সূর্য লাফানো বন্ধকরে একটা আগুনের রেখায় পরিণত হল, যেন মহাকাশে আগুনের উজ্জ্বল খিলান। চাঁদ পরিবর্তিত হল একটা সরু ম্লান আলোর রেখায়। নক্ষত্ররা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঝে মধ্যে গাঢ় নীল আকাশের বুকে চরকিবাজীর মত ছিটকে যেতে লাগল দু-একটা নক্ষত্র।

'চারপাশের দৃশ্যপট ঝাপসা অস্পষ্ট। তখনো আমি এই বাড়ীর নিচের পাহাড়ের ধারে ছিলাম বলেই মনে হচ্ছিল। বড় বড় পাথরের চাঁই খাড়া হয়ে ছিল আমার সামনে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম দলা দলা বাষ্পের মত গাছগুলো বড় হচ্ছিল আর বদলে যাচ্ছিল। এই বেগুনী এই সবুজ—বড় হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, কাঁপছে তারপরই মরে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম অসংখ্য প্রাসাদ চোখের সামনে ভেসে উঠছে, তারপর আবছা হয়ে স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ আমার চোখের সামনে পরিবর্তিত হচ্ছিল,—গলে গলে ভেসে যাচ্ছিল। স্পীডোমীটারের কাঁটা সরে সরে যাচ্ছিল, ইঙ্গিত দিচ্ছিল বাড়তি গতির। মহাকাশের সেই অগ্নিময় ফিতেটা অনবরত দুলছিল। এক একটা বছর কেটে যাচ্ছিল এক মিনিট সময়ের মধ্যে। সারা পৃথিবী জুড়ে সাদা বরফ পড়ছিল, আবার মুহূর্তে মুছে যাচ্ছিল। তারপরই দেখা দিচ্ছিল বসন্তের সবুজ সমারোহ, তবে তাও ক্ষণিকের জন্যে।

'প্রথম দিকের অস্বস্তিকর অনুভূতি অনেকটা কমে এসেছিল। আস্তে আস্তে সেই অনুভূতিটা একটা ক্ষ্যাপাটে সুখানুভূতিতে পর্যবসিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কাল-যন্ত্রটা যেন একটা মোড় ঘুরে ছুটে চলেছে। আমার মন সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়ছিল। এক ধরণের ক্ষ্যাপামো দেখা দিচ্ছিল সেখানে। এই নতুন অদ্ভুত অনুভূতি ছাড়া আমার মনে আর কিছুই রেখাপাত করছিল না। কিন্তু আস্তে আস্তে এক নতুন ধরণের ভাবনা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কৌতূহল ও ভয়। আমার

মনকে সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেলল ওরা। মনুষ্যত্বের কি অদ্ভুত উন্নতি। আমাদের সভ্যতার কি আশ্চর্যজনক পরিণতি। অদ্ভুত ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ভাস্কর্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমাদের সময় কারের ভাস্কর্য থেকে এগুলো বহুগুণ বড় ও সুন্দর। পাহাড়ের ধারে সবুজ রঙের একটা ধারা দেখতে পেলাম। ওটা ওইভাবেই রইল। মনের এই রকম বিপর্যস্ত অবস্থায়ও এই পৃথিবীকে আমার খুব ভাল লাগল। আর তখুনি মনে হল যন্ত্রটাকে এবার থামানো দরকার।

'থামলে কিসের উপর থামব জানি না। যতক্ষণ দ্রুত গতিতে ছুটছিলাম ততক্ষণ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কিন্তু থামার কথা মনে আসতেই নানা রকম দুশ্চিন্তা শুরু হল। কিসের মধ্যে গিয়ে পড়ব'! রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আমি ও আমার কাল-যন্ত্র বিস্ফোরণে কোন অজানা জগতে ছিটকে পড়তে পারি। কাল-যন্ত্রটা যখন গবেষণাগারে তৈরী করছিলাম তখন বার বার এ ধরনের দুশ্চিন্তা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কিন্তু তখন ছিল শুধুই দুশ্চিন্তা, কিন্তু এখন রূঢ় বাস্তব। এখন আর এটাকে হাল্কা ভাবে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ অদ্ভুত জগৎ, যন্ত্রের তীব্র গতি, আর দীর্ঘকাল ধরে উপর থেকে নিচে পড়ার বিচিত্র অনুভূতি আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে অসাড় করে ফেলছিল। আমার মন বলছিল, আমি হয়ত কখনো থামতে পারব না। কিন্তু তীব্র আকাঙ্খার বশে আমি হঠাৎ যন্ত্রটা থামিয়ে দিলাম। আমি জোর করে লীভারে চাপ দিলাম। সবকিছু আমার চারপাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল আর আমাকে কেউ যেন শূন্যে ছুড়ে দিল।

'মনে হল কারা যেন প্রচণ্ড জোরে হাততালি দিয়ে উঠল। মুহূর্তে আমি পাথর হয়ে গেলাম। একটা ভয়ঙ্কর নরক যেন আমার চারপাশে হিসিয়ে উঠল। দেখলাম কাল-যন্ত্রের সামনে মসৃণ নরম সবুজ ঘাসের উপর আমি পড়ে আছি। চারপাশের সবকিছু তখনো ধূসর বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই বীভৎস শব্দ থেমে গিয়েছিল। আমি চারপাশে ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। মনে হল একটা বাগানের লনে

আমি পড়ে আছি। চারিদিকে রডোডেনড্রন গাছের ঝোপ। রডোডেনড্রন ফুলের ফুটন্ত পাপড়িগুলো যেন এক ভয়াবহ ঝড়ের আঘাতে ঝরে পড়ছে। সেই ভয়ঙ্কর ঝড় একটা মেঘের উপর ভর করে যেন আমার যন্ত্রটার উপর ভাসছে। আমি মনে মনে বললাম, যে মানুষটা বহুবহু বছর পেরিয়ে তোমাদের দেখতে এলো তার সঙ্গে তোমরা খুব সুন্দর আতিথেয়তা দেখাচ্ছ বটে! বোকার মত ভিজছি। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আবার চারধারে তাকালাম। রডোডেনড্রন ঝোপের ওপারে সেই বৃষ্টির মধ্যে একটা সাদা পাথরের বিরাট চেহারা অস্পষ্ট ভাবে আমার নজরে পড়ল। এটুকু ছাড়া আর সবকিছু আমার কাছে অস্পষ্ট বলে মনে হল।'

'বৃষ্টি একটু কমে এলে সেই সাদা জিনিসটা আরো একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল। জিনিসটা প্রকাণ্ড উঁচু। একটা রূপোলী বার্চগাছ ওর কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছেছে। জিনিসটা সাদা মার্বেল পাথরের। চেহারাটা দেখতে কতকটা পাখাওলা স্ফিঙ্কসের মত। কিন্তু পাখাগুলো ছিল উড়ন্ত পাখির পাখার মত। পাগুলো খুব সম্ভব পিতলের। ওগুলোয় পুরু জং ধরে রয়েছে। মুখটা আমার দিকে ফেরানো ছিল। ওর দৃষ্টিহীন চোখ যেন আমাকেই লক্ষ্য করছিল। ওর ঠোঁটের কোণে যেন ক্ষীণ হাসির আভাস। বহুকাল ধরে ঝড়-বৃষ্টিতে ওটা ক্ষত-বিক্ষত। আমার মনে হল যেন কোন ভয়াবহ রোগে ওর এই অবস্থা হয়েছে। আমি জিনিসটার দিকে তাকিয়েছিলাম,—খুব সম্ভব আধ মিনিটের মত, অথবা আধ-ঘণ্টাও হতে পারে। মনে হল বৃষ্টি কমা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই অদ্ভুত মূর্তিটা এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। অবশেষে আমি ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তারপরই ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশে আলোর আভাস ফুটে উঠল। অর্থাৎ এবার সূর্য উঠবে।'

'আমি মুখ তুলে আবার সেই শ্বেত মূর্তিটার দিকে তাকালাম আর তখুনি এই সময়-পর্যটনের ভয়াবহতা অনুভব করলাম। অস্পষ্ট ঝাপসা পর্দাটা সরে গেলে আমার চোখের সামনে কি ভেসে উঠবে? কোন

মানুষের ভাগ্যে যা ঘটেনি তাই কি ঘটবে আমার ভাগ্যে? প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতা কি পরিণত হবে ভালবাসায়? যদি সময়ের ব্যবধানে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে থাকে? যদি তারা পরিবর্তিত হয়ে থাকে অমানুষে? যদি তারা সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়? যদি তারা পরিণত হয়ে থাকে দানবে? তাহলে আমি হয়ত প্রাচীন পৃথিবীর বুনো হিংস্র প্রাণীদের দেখতে পাব। হয়ত তারা হবে অকল্পনীয় ধূর্ত ও শঠ।'

'চারপাশে আরো বিরাট বিরাট সব জিনিস দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, লম্বা লম্বা থাম আর উঁচু উঁচু প্লাটফরম আমার চোখে পড়ল। দেখতে পেলাম গাছপালায় ঢাকা পাহাড়। আতঙ্কে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আমি ছুটে কাল-যন্ত্রে উঠে বসলাম। ওটা চালাবার জন্য ঠিক করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম। ঠিক সেই সময় সূর্যের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ল। মাথার উপরে দেখতে পেলাম গভীর নীল গ্রীষ্মের আকাশ। হাল্কা বেগুনী রঙের মেঘগুলো ভাসতে ভাসতে দূরে কোন অজানা লোকে পাড়ি জমালো। আমার চারপাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়িঘরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওদের বৃষ্টিভেজা দেওয়ালে সূর্যের আলো পড়ে ঝলমল করে উঠল। রাস্তায় জমে থাকা শিলাগুলো চকচক করতে লাগল। এই অদ্ভুত রাজ্যে নিজেকে বিবস্ত্র বলে মনে হল আমার। উন্মুক্ত আকাশে ওড়ার সময় ছোট পাখিরা যেমন বাজপাখীর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, আমার মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হল। আমার ভয় আস্তে আস্তে পরিণত হল আতঙ্কে। আমি জোরে শ্বাস নিলাম, দাঁতে দাঁত চেপে ধরলাম, তারপর পাগলের মত আমার কব্জি ও হাঁটু দিয়ে কাল-যন্ত্রে ধাক্কা দিলাম। এই প্রচণ্ড চেষ্টার ফলে যন্ত্রের হাতলটা ঘুরে গিয়ে আমার চিবুকে আঘাত হানল। বসবার আসনে একহাত রেখে আর একহাতে হাতলটা চেপে ধরে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম, আর যন্ত্রটা চালাবার কথা ভাবতে লাগলাম।'

'কিন্তু হঠাৎ যেন আমি মনের জোর খুঁজে পেলাম। আমি কৌতূহলী হয়ে আবার ভবিষ্যতের এই অদ্ভুত জগতের দিকে তাকালাম। আমার কাছের একটা বাড়ির উঁচু গোল বারান্দায় দেখতে পেলাম একদল লোক খুব সুন্দর দামী পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে। ওদের সবার মুখ আমার দিকে ফেরানো।'

'এরপর শুনতে পেলাম কিছু কণ্ঠস্বর আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই সাদা স্ফিঙ্কসের পাশ দিয়ে ঝোপের ভিতর দিয়ে ওরা আসছে। একজন সামনের রাস্তা দিয়ে লনের দিকে ছুটে এলো। ওই লনে আমি আমার যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা ছোট্ট প্রাণী। খুব সম্ভব চারফুট লম্বা। হাল্কা নীল রঙের পোষাক পরণে। কোমরে বাঁধা চামড়ার বেল্ট। ওর পায়ে চটি জাতীয় কিছু ছিল। ওর পা হাঁটু অবধি খালি। মাথায় কোন টুপি ছিল না। এসব দেখে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।'

'ওকে দেখে আমার মনে হল ও খুব সুন্দর, কিন্তু বেশ দুর্বল। ওর রক্তিম গালের দিকে তাকিয়ে আমার সেই বহু কথিত সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে গেল। ওকে দেখে আমি আবার সাহস ফিরে পেলাম। আমি যন্ত্রের হাতল থেকে হাত উঠিয়ে নিলাম।'

চার

'পরমুহূর্তে আমরা মুখোমুখি দাঁড়ালাম। আমি আর ভবিষ্যতকালের এক দুর্বল প্রাণী। ও সোজাসুজি আমার সামনে এসে আমার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল। ও আমাকে দেখে একটুও ভয় পেল না। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ অদ্ভুত বলে মনে হল।

'এরপর ও ঘুরে অন্য দুজনের দিকে তাকালো। ওরা ওর পিছনে পিছনে আসছিল। এরপর ও ওদের সঙ্গে এক বিচিত্র ভাষায় খুব ও হাল্কা স্বরে কি সব কথা বলল।'

আরো লোক আসছিল। এর মধ্যে প্রায় আট-দশজনের একটা দল আমাকে ফিরে ফেলেছিল। ওদের মধ্যে একজন আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলল। কথাটা আমি বুঝতে পারলাম। আমি ঘাড় নেড়ে আমার কানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম, তারপর আবার ঘাড় নাড়লাম। কথা বলতে আমার কেমন যেন খারাপ লাগছিল. মনে হচ্ছিল আমার কণ্ঠস্বর এদের কাছে নিশ্চয় খুব কুৎসিত বলে মনে হবে। ও আমার দিকে একটু এগিয়ে এল। তারপর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে আমার হাত স্পর্শ করল। আমি আরো একটা নরম স্পর্শ পেলাম আমার পিঠে ও ঘাড়ে। ওরা আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাইছিল। আমার কিন্তু একটুও ভয় করছিল না। এই সুন্দর ছোট্ট প্রাণীদের ব্যবহারে এমন কিছু ছিল, যা প্রায় শিশুর মত সরল ও মধুর। আমি মনে যথেষ্ট জোর পেলাম। ওদের আমার খুবই হাল্কা আর দুর্বল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে একটা বল যদি ওদের দিকে গড়িয়ে দিই তো সে ধাক্কায় হয়ত ওরা মাটিতে গড়িয়ে পড়বে। যখন দেখলাম ওরা ওদের বেগুনী রঙের ছোট ছোট হাত দিয়ে আমার কাল যন্ত্রটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে শুরু করেছে তখন আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের সাবধান করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি যন্ত্রের হাতলটা খুলে পকেটে ঢোকালাম। তারপর ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে আবার ঘুরে দাঁড়ালাম।'

'আরো কাছ থেকে ভাল করে ওদের দেখে আরো কতকগুলো বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করলাম। ওদের মাথার কোঁকড়া চুল ঘাড় ও জুলফি পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখে কোন গোঁফদাড়ির চিহ্ন নেই। কানদুটো সুন্দর চ্যাপ্টা, ছোট মুখ, লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁট। চিবুকটা সুরু। বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ। একটা জিনিস আমার কাছে

খারাপ লাগছিল, তা হল আমার সম্বন্ধে ওদের যতখানি কৌতূহলী হয়ে ওঠা উচিত ছিল, তা যেন ওরা হচ্ছিল না।'

'ওরা আমার সঙ্গে কথা বলার কোন চেষ্টা না করে আমার চারধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল ও ফিসফাস করে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। অতএব বাধ্য হয়ে আমি কথা-বার্তা শুরু করলাম। আমি কাল-যন্ত্র ও আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম। কিভাবে 'সময়' বোঝাবো তা ঠিক বুঝতে না পেরে আঙুল দিয়ে সূর্যকে দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর চেহারার একটি জীব আমার ভঙ্গি লক্ষ্য করে বাজ পড়ার শব্দ করল মুখ দিয়ে।'

'আমি চমকে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এই প্রাণীগুলো কি একদম বোকা? আমার মনের অবস্থা আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। আমি গোড়া থেকে ভেবে আসছিলাম যে সুদূর ভবিষ্যতের এই প্রাণীগুলো বুদ্ধি, শিল্প: সংস্কৃতিতে আমাদের থেকে অনেক উন্নত হবে। এরপর ওদের মধ্যে থেকে একজন আমাকে একটা প্রশ্ন করল। তাতেই বুঝতে পারলাম ওদের বুদ্ধিমত্তা আমাদের একটা পাঁচ বছরের ছেলের বুদ্ধিমত্তার থেকে একটুও বেশী না। ও আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি কি সূর্য থেকে এই শিলাবৃষ্টির সঙ্গে নেমে এসেছি? এরপর ওদের সম্বন্ধে আমার আগেকার সব ধারণা পাল্টে গেল। আমি মনে মনে খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। মনে হল এই কাল-যন্ত্রটা তৈরী করা একটা বাজে কাজ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। শুধু শুধু আমি সময় নষ্ট করেছি।'

'আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম, তারপর মুখ দিয়ে বাজ পড়ার শব্দের মত এমন শব্দ করলাম যে ওরা ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গেল। তারপর ওদের মধ্যে একজন হাসতে হাসতে আমার কাছে এগিয়ে এসে একটা ফুলের মালা আমার গলায় পরিয়ে দিল। মালার একটা ফুলও আমি চিনতে পারলাম না। আমাকে স্বাগত জানালো ওরা। তারপর ওরা হাসতে হাসতে ফুলে ফুলে আমাকে প্রায়

ঢেকে দিল। আপনারা যাঁরা এ জিনিস দেখেননি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না, বহু বছরের সাধনায় কি সুন্দর আর হালকা ফুল তৈরী সম্ভব।'

এরপর একজন বলল যে আমাকে ওরা সামনের প্রাসাদে নিয়ে যাবে। সুতরাং আমি ওদের সঙ্গে শ্বেতপাথরের স্ফিঙ্কস্ মূর্তির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললাম। মনে হল এতক্ষণ হাসি হাসি মুখে এই শ্বেত-দৈত্য যেন আমাকে লক্ষ্য করছিল।

'প্রাসাদের প্রবেশ দ্বার প্রকাণ্ড। ক্রমশঃ আমার চারপাশে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। আমার সামনের দরজার পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্যময় জগত। ওদের মাথার উপর দিয়ে দেখতে পেলাম সুন্দর সুন্দর জট পাকানো ঝোপ, বিচিত্র ধরণের ফুল আর অনেকদিনের অযত্ন রক্ষিত কিন্তু আগাছাহীন বাগান। লম্বা লম্বা অদ্ভুত ধরণের সাদা ফুল আমার নজরে পড়ল। পাপড়িগুলো প্রায় এক ফুট করে লম্বা। বুনো ফুলের মত ওগুলো এখানে ওখানে ফুটে রয়েছে। ফুলগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলাম না। কাল-যন্ত্রটা পড়ে রইল রডোডেনড্রন ফুলের ঝোপের মধ্যে।'

'দরজার খিলানে নানারকমের কারুকার্য করা। কারুকার্যগুলো খুঁটিয়ে দেখতে পেলাম না বটে তবে এক নজর দেখেই মনে হল ফোনেসিয়ান কারুকার্যের সঙ্গে এগুলোর যথেষ্ট মিল আছে। এটাও বুঝতে কষ্ট হল না যে কারুকার্যগুলো বহুদিনের পুরোনো। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে, ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গেছে। দরজার কাছে উজ্জ্বল পোষাক-পরা আরো কিছু লোককে দেখতে পেলাম। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। উনবিংশ শতাব্দীর পোষাকে আমাকে এদের মধ্যে বেশ অদ্ভুত লাগছিল। আমাকে আবার ফুলের মালা পরিয়ে দিল ওরা। তারপর জোয়ারের মত আমার চারপাশের ভিড় বাড়তে আরম্ভ করল। উজ্জ্বল পোষাক, ফর্সা চেহারা, হাসি আর কলকাকলিতে জায়গাটা ভরে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'দরজার পরই বিরাট হলঘর। ছাদটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। জানালাগুলোয় কিছু কিছু রঙীন কাচের পাল্লা, কিছু সাধারণ কাচের পাল্লা। মেঝেয় চৌকো চৌকো কঠিন সাদা ধাতুর ব্লক বসানো। কিন্তু এত পুরোনো যে মাঝে মাঝে গর্ত হয়ে গেছে। মেঝেয় আড়াআড়িভাবে পালিশ করা পাথরের স্ল্যাবের বহু টেবিল বসানো। মেঝে থেকে ওগুলো ফুটখানেক উঁচু। টেবিলের উপর ফলের পাহাড় সাজানো। ওর মধ্যে র‍্যাসপবেরী ও কমলালেবু ছাড়া আর একটা ফলও চিনতে পারলাম না। টেবিলের পাশে বহু বসবার আসন ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় রয়েছে। আমাকে যারা পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো ওরা ওই আসনগুলোয় ঝপাঝপ বসে পড়ে আমাকেও ইশারায় বসতে বলল। তারপর টেবিলে ফলগুলো তুলে তুলে খেতে শুরু করে দিল। আমিও ওদের দেখা-দেখি খেতে শুরু করলাম, কারণ আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলাম। খেতে খেতে আমি ভালো করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম।'

'প্রথম যে ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ল তা এই প্রাসাদের জরাজীর্ণ অবস্থা। জানলার কাচগুলো নোংরা দাগ ধরা, কোথাও ভেঙে গেছে, কোথাও ফেটে গেছে। পর্দাগুলো ধূলিধূসরিত ও মোটা। আমার পাশের মার্বেল পাথরের টেবিলটা ভাঙা। কিন্তু তবু খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। প্রায় ২০০ লোক এই হলঘরে খাওয়া দাওয়া করছে। সবাই আমার খুব কাছাকাছি এসে বসেছে। আমাকে খুব কৌতূহলী হয়ে লক্ষ্য করছে ওরা। সবার পরণে রেশমের সুন্দর নরম পোষাক।'

ফল ওদের একমাত্র খাদ্য। ভবিষ্যতের এই লোকগুলোর নিরামিষাসী। ওদের সঙ্গে আমাকেও নিরামিষাসী হতে হল। পরে অবশ্য আমি দেখেছিলাম যে গরু, ঘোড়া, ভেড়া, কুকুর সবই নিশ্চিহ্ন এদের সময়ে। ফলগুলো অবশ্য খুবই সুস্বাদু। তার মধ্যে একটা ফল আমি ওখানে যতদিন ছিলাম খেয়েছি। প্রথমে অবশ্য আমি এইসব

অদ্ভুত ফল দেখে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ঘাবড়ে গিয়েছিলাম বিচিত্র সব ফুল দেখে। পরে অবশ্য সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম। তারপর যেই আমার খিদেটা একটু কমে এলো, আমি ওদের কথাবার্তা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ফল দিয়ে আরম্ভ করাটাই ঠিক হবে বলে মনে হল। একটা ফল উঁচু করে ধরে আমি কিছু প্রশ্নবোধক শব্দ ও ভঙ্গি করলাম। আমার কথা বোঝানোর জন্য আমাকে যথেষ্ট কষ্ট করতে হল। প্রথমে আমার প্রশ্ন শুনে ওরা খুব অবাক হল, তারপর হেসে গড়িয়ে পড়ল। ওদের মধ্যে থেকে একজন বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরে একটা নাম বার বার উচ্চারণ করতে লাগল। ওরা নিজেদের মধ্যে অনেক কিছু বলাবলি করল। আমি ওদের মত ছোট্ট একটু শব্দ করতে পারায় ওরা খুব খুশী হয়ে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল এক দঙ্গল স্কুলের ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি মাষ্টারমশায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ কতকগুলো বিশেষ্য পদ উচ্চারণ করতে শিখে গেলাম। তারপর সর্বনাম এমন কি 'খাওয়া' এই ক্রিয়া পদটিও শিখে গেলাম। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ সময়-সাপেক্ষ। ওরাও আমার প্রশ্নের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কথা ভাবছিল। তাই আমি বললাম—ওদের যখন ইচ্ছে হবে তখন ওরা আমাকে একটু একটু করে শেখাবে। কিন্তু পরে দেখেছিলাম অল্প অল্প শেখাতেও ওদের কোন আগ্রহ নেই। এরকম কুঁড়ের দল আমি জীবনে দেখিনি।'

'একটা অদ্ভুত জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম। বাচ্চা ছেলেদের মত ওরা ভীষণ কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের কৌতূহল উবে যাচ্ছিল। ওরা তখন অন্য ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ডুবে যাচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া ও আমার প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হল। তখন লক্ষ্য করলাম যে প্রথমে আমার চারপাশে যারা ভিড় করে ছিল তারা কখন নিঃশব্দে চলে গেছে। এই মানুষগুলো সম্বন্ধে আমার যেটুকু শ্রদ্ধা জেগেছিল তা খুব তাড়াতাড়ি

নষ্ট হয়ে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমি অনবরত এইসব ভবিষ্যদ্বাসীদের দেখছিলাম। ওরা আমাকে অনুসরণ করছিল, আমার সম্বন্ধে কথা বলছিল ও হাসাহাসি করছিল তারপর একসময় আমার দিকে তাকিয়ে হেসে চলে যাচ্ছিল।'

'আমি যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। অস্তগামী সূর্যের লাল আলোয় সমস্ত দৃশ্যপট আলোকিত। এখানে সবকিছু আমার কাছে কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। আমার জানা জগতের সঙ্গে এ পৃথিবীর আকাশ-পাতাল তফাৎ। এইমাত্র যে বিরাট প্রাসাদটা থেকে বেরিয়ে এলাম, ওটা একটা চওড়া নদীর উপত্যকার ঢালুতে অবস্থিত। টেমস নদী তার বর্তমান জায়গা থেকে প্রায় এক মাইল সরে গেছে। আমি মনে মনে ঠিক করলাম দেড় মাইল দূরে ওই যে একটা পাহাড়ের চূড়া রয়েছে ওটার উপরে উঠতে হবে। ওখান থেকে ভবিষ্যতের পৃথিবীকে ভালভাবে দেখতে পাব।'

'আমি এগিয়ে যেতে যেতে চারিদিকে ভাল করে লক্ষ্য করছিলাম। বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কেন চারিদিকে এরকম জরাজীর্ণ অবস্থা। পাহাড়ের একটু উঁচুতে গ্রানাইট পাথরের বিরাট এক স্তূপ দেখতে পেলাম। এ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে ওটা বেঁধে রাখা হয়েছে। গোলকধাঁধাঁর মত বিরাট জীর্ণ দেওয়াল নজরে পড়ল। তার মধ্যে প্যাগোড়ার মত দেখতে সুন্দর গাছের ঝোপ। পাতাগুলোর রঙ বেগুনী। দেখেই বোঝা যায় যে বিরাট কিছুর পরিত্যক্ত ধ্বংসাবশেষ ওটা। কিন্তু ওটা যে কি ছিল তা বুঝতে পারলাম না। পরে এখানে আমি এক অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করেছিলাম। সেকথা যথা সময়ে বলব।'

'কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতে পারলাম এখানে ছোট ঘরবাড়ি নেই। এখানে ওখানে সবুজ মাঠের মধ্যে বড় বড় সব প্রাসাদ।'

'এখানে বোধ হয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত। মনে মনে ভাবলাম আমি। তারপরই আর একটা কথা আমার মনে পড়ল। যে জনাছয়েক প্রাণী আমাকে অনুসরণ করছিল আমি তাদের দিকে ফিরে

তাকালাম। পরমুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম এরা সবাই একই রকমের পোষাক পরে আছে। সবারই মুখ গোঁফ-দাড়ি হীন আর প্রত্যেককেই মেয়েদের মত দেখতে। ব্যাপারটা আগে আমার নজরে পড়েনি বলে একটু অবাক হলাম। এবার ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পোষাক-পরিচ্ছদ আর অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষ আর নারী আলাদা করে বুঝতে পারলেও চেহারার দিক থেকে ওদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর বাচ্চাগুলো যেন ওদের মা-বাবার অবিকল ছোট প্রতিকৃতি। বুঝলাম এদের যুগের ছেলেমেয়েরা বেশ অকালপক্ক অন্তত দৈহিক দিক থেকে। অবশ্য পরে আমার ধারণার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণও পেয়ে ছিলাম।'

'এদের এই সহজ জীবনযাত্রা দেখে আমার মনে হল এটা সম্ভব হয়েছে ওদের এই অদ্ভুত চেহারার জন্য। কারণ পুরুষের শক্তি, নারীর কমনীয়তা, পরিবার, পেশাগত পার্থক্য এ সবই এমন একটা সমাজের ব্যাপার যেখানে শারিরীক শক্তি মুখ্য। জনসংখ্যা যেখানে অনিয়ন্ত্রিত ও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট সেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যেখানে হিংসার স্থান নেই, সন্তান-সন্ততিদের মানুষ করে তোলার কোন চিন্তা নেই, সেই সমাজে পরিবার প্রথার কোন দরকার নেই। আমাদের সময়ে ব্যাপারটার শুরু হয়েছিল এদের কালে তা বোধহয় সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশ্য এসবই আমার ধারণা।'

'আমি যখন এইসব কথা ভাবছিলাম, তখন হঠাৎ একটা জিনিসের উপর আমার নজর পড়ল। মনে হল একটা কূয়ো আর তার উপরে একটা গোল ছাদ। এরকম ধরনের কূয়ো আজো আছে? তারপর আমি আবার আগেকার ভাবনার খেই ধরলাম। পাহাড়ের উপরের দিকে কোন বড় বাড়ি নেই। আমি বেশ জোরে জোরে হাঁটছিলাম। এখন আমি সম্পূর্ণ একা। ওরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। নিজেকে এবার স্বাধীন মনে হল। এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় আমি পাহাড়ের উপরের দিকে উঠতে লাগলাম।'

'উপরে একটা হলুদ রঙের ধাতব বেঞ্চ দেখতে পেলাম। গোলাপী রঙের মরচে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। কোথাও কোথাও নরম শেওলা জমেছে। বেঞ্চের হাতলগুলো 'গ্রিফিন' এর মাথার মত কারুকার্য্য করা। আমি আসনটিতে বসলাম। এখান থেকে আমি বিস্তৃত দৃশ্যপট দেখতে পেলাম। সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছে। এমন সুন্দর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। সূর্য দিগন্তে নেমে গেছে। পশ্চিম আকাশে জ্বলন্ত সোনার রঙ লেগেছে। নিচে টেমস নদীর উপত্যকা। উজ্জ্বল ইস্পাতের পাতের মত নদী ছড়িয়ে রয়েছে সবুজ উপত্যকার এখানে ওখানে। বড় বড় প্রাসাদ যার কথা আমি আগেই বলেছি। কোন কোনটা-ভেঙে পড়েছে। কোন কোনটাতে এখনো লোক বাস করছে। এখানে-ওখানে সাদা রূপোলী স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। কোন জমিতে বেড়া বা আল নেই। চাষবাসের কোন চিহ্ন নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে যেন একটা বাগান।'

'এভাবে চারিদিক দেখতে দেখতে এই অচেনা জগত সম্বন্ধে আমি একটা ধারণা করে ফেললাম (পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম আমার ধারণা খুব একটা ঠিক ছিল না।)

'আমার মনে হল আমি মানুষের সভ্যতার শেষ স্তরে এসে পৌঁছেছি। ওই রক্তাক্ত সূর্যাস্ত যেন মানব সভ্যতার শেষ সূর্যাস্ত। এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম কি অদ্ভুত রূপ পরিগ্রহ করেছে মানব সভ্যতা। শক্তি হচ্ছে প্রয়োজনের ফসল। সভ্যতার আর এক নাম হচ্ছে জীবনধারণের অবস্থার ক্রমোন্নতি। যাতে জীবনে নিরাপত্তা আসে। প্রকৃতিকে জয় করেছে মানুষ যুগে যুগে। আজ যা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে তা বাস্তবায়িত করার জন্য মানুষ চেষ্টা করেছে। আজ যা আমি আমার চোখের সামনে দেখছি তা এসবের সম্মিলিত ফল।'

'জলনিষ্কাষণের ব্যবস্থা ও চাষবাস আমাদের সময় খুবই প্রাথমিক স্তরে ছিল। আমাদের কালের বিজ্ঞান এর উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছে; কিন্তু বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি। তবু সে হাল

ছাড়েনি। আমরা আমাদের পছন্দসই গাছ-গাছালি ও জীবজন্তুর উন্নতি ঘটিয়েছি। কিন্তু এখন তাদের কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখন নতুন ও ভাল বীজ, বিচিহীন আঙুর, বড় বড় ফুল। আমরা আস্তে আস্তে ওদের উন্নত করে তোলার চেষ্টা করেছি। তার কারণ কি করতে চাই সে সম্বন্ধে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমাদের জ্ঞানও ছিল সীমিত। প্রকৃতিকে আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি ; কিন্তু বুঝতে পেরেছি খুবই অল্প। একদিন এসব সুন্দর হয়ে উঠবে, আরো সুন্দর। সারা পৃথিবীর মানুষ বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে। শিক্ষিত হবে, তারা পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগীতা করবে। প্রকৃতিকে জয় করবে তারা দ্রুত। সব শেষে আমাদের প্রয়োজনীয় জীবজন্তু ও গাছপালার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হবে।

'এখন আমার মনে হচ্ছে এরা, এই অজানা ভবিষ্যতের মানুষরা সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। চারপাশের বাতাসে মশা-মাছি উড়ছে না। আগাছামুক্ত পৃথিবী। সব জায়গায় সুমিষ্ট ফল, সুন্দর সুন্দর বিচিত্র সব ফুল। রঙীন প্রজাপতিরা উড়ে বেড়াচ্ছে এখানে-ওখানে। রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। আমি যতদিন ছিলাম কোন রোগের চিহ্ন দেখতে পাইনি।'

'সামাজিক উন্নতিও হয়েছে যথেষ্ট। পোষাক-পরিচ্ছদ মহার্ঘ ও জৌলুসপূর্ণ। কোন কঠিন কাজ কাউকে আমি করতে দেখিনি। দোকানপাট, বিজ্ঞাপন, যানবাহন যা আমাদের কালের জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গ ছিল তার কিছু নেই। সেই স্বর্ণকরোজ্জ্বল সন্ধ্যায় আমার মনে হল এরা এক স্বর্গরাজ্যে বাস করছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যা বলে এদের কিছুই নেই। জনসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত।

'এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাই তো মানুষের শক্তি ও বুদ্ধির উৎস।

'জীবন সংগ্রাম ও মুক্তি, শক্তিমানরা বেঁচে থাকে আর দুর্বলরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরিবার ব্যবস্থা, আর সেই আবেগময় পারিবারিক

বন্ধন, তীব্র ঈর্ষা, অপত্যস্নেহ, সন্তান-সন্ততিদের বিপদ থেকে রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা এ সবই আমাদের কালের কথা। কিন্তু এখানে কোন ভয় নেই, নেই কোন বিপদ। দাম্পত্য ঈর্ষার বিরুদ্ধে, মাতৃত্বের বিরুদ্ধে, অন্যান্য সব তীব্র আবেগের বিরুদ্ধে কোন মনোভাবেরই সৃষ্টি হয় না এখন। এগুলো এখন অপ্রয়োজনীয়। যা আমাদের জীবন অস্বস্তিতে ভরে তুলত এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।'

'আমি ওদের দৈহিক দুর্বলতার কথা ভাবতে লাগলাম, ভাবতে লাগলাম ওদের বুদ্ধির দৈনতা সম্পর্কে ওদের জরাজীর্ণ বাসগৃহ সম্বন্ধে। আমার মনে হল ওরা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় করেছে। কারণ যুদ্ধের পরে আসে শান্তি। মানুষ একদিন শক্তিমান, বুদ্ধিমান ও উৎসাহী ছিল। সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছিল তার পরিবেশক পরিবর্তন করার জন্য। আজ সেই পরিবর্তনের ফল দেখা যাচ্ছে।

'আজ এই নতুন আরামদায়ক ও স্থিতিশীল জীবনে শক্তির সেই চাঞ্চল্য যা আমাদের কালে উদ্যম বলে পরিচিত ছিল তা এখন পরিণত হয়েছে দুর্বলতায়। আমাদের সময়েই আমরা দেখছি যে এককালে বেঁচে থাকার জন্য যা খুবই প্রয়োজন ছিল তা ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বীরত্ব ও যুদ্ধস্পৃহা সভ্যজগতে অচল। শুধু অচল নয়, বাধাস্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল আর যেখানে দৈহিক শক্তির সাহায্যে নিরাপত্তা বজায় রাখতে হয় না, সেখানে শক্তি, ও বুদ্ধির যে কোন স্থান নেই এ তো খুব সহজ ব্যাপার। আমার মনে হল এখানে কোন যুদ্ধের আতঙ্ক নেই, হিংসাত্মক কাজের স্থান সেই, বুনো হিংস্র জন্তুর ভয় নেই, কোন শক্ত অসুখ নেই তাই শ্রমেরও কোন প্রয়োজন নেই, এরকম জীবনে যাদের আমরা দুর্বল মনে করছি, আসলে তারা হয়ত মোটেও দুর্বল নয়। বরং এরকম একটা সমাজে, আমাদের মাপকাঠিতে যারা শক্তিমান, তারা নিজেদের হয়ত খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। তারা শক্তিকে কাজে লাগানোর কোন সুযোগই খুঁজে পাবে না এখানে। যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ দেখলাম, সন্দেহ নেই

সেসব প্রাসাদ তৈরী হয়েছে শক্তিমান মানুষের দ্বারা। তবে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছুবার আগেই এসব প্রাসাদ তৈরী শেষ হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। শক্তি, প্রথমে প্রেম ও শিল্পের দিকে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে, তারপর নিয়ে যায় অবসন্নতার দিকে এবং পরিশেষে ধ্বংসের দিকে।'

'এদের কালে শিল্পবোধ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে বলেই আমার মনে হল। এরা খুব ফুল ভালবাসে, সূর্যের আলোয় নাচগান করতে ভালবাসে। ব্যস! শিল্পবোধের এইটুকুই অবশিষ্ট আছে। এটুকুও একদিন শেষ হয়ে যাবে। তারপর এরা সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে পড়বে।'

'প্রয়োজন ও যন্ত্রণার জাঁতাকলে আমরা নিয়ত পেষাই হচ্ছি বলেই আমরা সজাগ থাকতে বাধ্য হই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সেই জাতাকলটা বোধহয় এদের কালে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

'আসন্ন সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাবতে লাগলাম যে এই সহজ ব্যাপারটা যখন বুঝতে পেরেছি তখন এদের সমস্যার মূলসূত্রও আমার কাছে স্বচ্ছ। এদের গোপন রহস্য জানতে আমার একটু ও বাকি নেই। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতি ওরা প্রয়োগ করেছে তাতে সফলই হয়েছে। শুধু তাই নয় ওদের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে আসছে। চারিদিকের এই ধ্বংসাবশেষ তারই প্রমাণ। আমার তত্ত্ব খুবই সহজ বোধ্য ছিল। অবশ্য সব ভুল তত্ত্বই খুব সহজ বলে মনে হয়!'

পাঁচ

'আমি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের চরম উন্নতির কথা ভাবছিলাম তখন উত্তর-পূর্ব আকাশে রূপোলী আলো ছড়িয়ে চাঁদ উঠল। নীচের উজ্জ্বল চেহারার মানুষগুলোর চলাফেরা আর বোঝা যাচ্ছিল না। একটা

পেঁচা নিঃশব্দে আমার পাশ দিয়ে উড়ে গেল। হঠাৎ ঠাণ্ডায় আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। এবার আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে রাতে থাকার মত একটা আস্তানা জোগাড় করতে হবে।'

'যে বাড়ীটায় আমি ঢুকেছিলাম সেই বাড়িটা খুঁজলাম। ব্রোঞ্জের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই সাদা স্ফিঙ্কস মূর্তিটি আমার চোখে পড়ল। চাঁদের আলোয় মূর্তিটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ওর পিছনের বার্চগাছগুলোও আমার নজরে পড়ছিল। রডোডেনড্রন গাছের ঝোপ-গুলোকে কালো কালো দেখাচ্ছিল। ছোট্ট লনটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। লনটার দিকে আমি আবার ভাল করে তাকালাম। আর তক্ষুণি একটা প্রচণ্ড ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আমি নিজে নিজে বলে উঠলাম, না ওটা লন হতে পারে না।'

'কিন্তু ওটাই সেই লন। সাদা স্ফিঙ্কসের মুখটা লনের দিকেই রয়েছে আগেকার মত। ব্যাপারটা স্পষ্ট হতেই আমার মনের যে অবস্থা হল তা আপনারা কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন না। লনে আমার কাল-যন্ত্রটা ছিল না।'

'সঙ্গে সঙ্গে আমি ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। বুঝলাম আমৃত্যু আমাকে এই অদ্ভুত জগতেই বাস করতে হবে। নিজের কালের পৃথিবীতে আমি আর কোনদিনই ফিরে যেতে পারব না। এই চিন্তাটা যেন আমার গলা চেপে ধরল। আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। পরমুহূর্তে আমি পাগলের মত নীচের দিকে ছুটতে শুরু করলাম। একবার আমি পা হড়কে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, মুখ কেটে রক্ত বেরুতে লাগল, কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার তখন আমার সময় নেই। আমি ছুটতে লাগলাম, আর ভাবতে লাগলাম, হয়ত ওরা যন্ত্রটাকে কোথাও সরিয়ে টরিয়ে রেখেছে। রাস্তার উপর থেকে সরিয়ে হয়ত কোন ঝোপের পাশে রেখেছে। তবু আমি না থেমে তাড়া-খাওয়া জন্তুর মত ছুটতে লাগলাম। মনে মনে ভরসা রাখছিলাম সেরকম সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছিলাম যন্ত্রটা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে।

মিথ্যে সান্ত্বনায় কোন ফল হবে না। যন্ত্রণায় আমার চোখে জল এসে গেল। পাহাড়ের উপর থেকে ছোট লনটা পর্যন্ত আমি দশ মিনিটে পাড়ি দিয়েছি। আমি যুবক নই। ছুটতে ছুটতে আমি নিজের বোকামীর জন্য নিজেকেই অভিসম্পাত করতে লাগলাম। যন্ত্রটা এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া আমার মোটেও উচিত হয়নি। আমি চিৎকার করে উঠলাম; কিন্তু কারো কোন সাড়া পেলাম না। সেই চন্দ্রালোকিত পৃথিবীতে কোন জীবন্ত প্রাণী আছে বলে আমার মনে হল না।'

লনে যখন পৌঁছুলাম তখন আমার ভয় চরমে উঠল। কোথাও যন্ত্রটার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ভাল করে খুঁজেও যখন যন্ত্রটা দেখতে পেলাম না, তখন আমার সারা শরীর অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। ঝোপের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম, তারপর ওটা না পেয়ে মাথার চুল চেপে ধরলাম হতাশায়। আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই স্ফিংক্স। ওর ব্রোঞ্জের পাটাতনটা চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে। মনে হল আমার দুর্ভাগ্য দেখে ও যেন মিটিমিটি হাসছে।

'এখানকার মানুষগুলোর দৈহিক শক্তি সম্বন্ধে আমার যদি কোন সন্দেহ থাকত তাহলে হয়ত ভাবতে পারতাম যে ওরা দুষ্টুমী করে আমার কাল-যন্ত্রটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। আমি মাটিতে ধপ করে বসে পড়লাম। ভাবতে লাগলাম এরপর আমি কি করব। আমি খুব ক্লান্ত হয়ে চারিদিকে চোখ বুলোতে লাগলাম। তারপর একসময় ওই লনেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের প্রসন্নতা আমার মনকে খুশী করতে পারল না। আমি সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তবু দিনের আলোয় লনের মাটি খুব ভাল করে পরীক্ষা করলাম। মানুষজন আসতে শুরু করলে আমার ক্ষমতা অনুযায়ী ওদের নানারকম প্রশ্ন করে কিছুটা সময়ের অপব্যয় করলাম।

'আমার অঙ্গভঙ্গি ওরা কেউ বুঝতে পারল বলে মনে হল না। কেউ কেউ বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল। কেউ মনে করল আমি ভাঁড়ামী

করছি, তাই ওরা হাসতে শুরু করে দিল। আমার ইচ্ছে করছিল ওদের মুখগুলো থেঁতলে দিই। অতি কষ্টে নিজেকে দমন করলাম। আমি বারবার ভাল করে লনটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ এক জায়গায় ঘাসের উপর একটা দাগ আমার নজরে পড়ল। দাগটা আমি যেখানে কাল-যন্ত্রটা রেখেছিলাম সেখান থেকে স্ফিঙ্কসের পাটাতনের মাঝামাঝি পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আশেপাশে কিছু পায়ের দাগও দেখতে পেলাম। আমার কেমন যেন মনে হল এগুলো শ্লথের পায়ের চিহ্ন। এবার আমি পাটাতনটা ভাল করে পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। আগেই বলেছি, পাটাতনটা ব্রোঞ্জের। পাটাতনটা সাদামাটা নয়। ওটার সারা গায়ে কারুকার্য করা আর দুদিকে দুটো দরজা মত। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বুঝতে পারলাম পাটাতনটা ফাঁপা। দরজা দুটো ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম ওতে কোন হাতল বা চাবির ফুটো নেই। খুব সম্ভবত দরজা দুটো ভিতর থেকে খোলার ব্যবস্থা আছে। একটা জিনিস খুব স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে আমার কাল-যন্ত্রটি ওই পাটাতনের ভিতরে। কি করে ওটা ওখানে গেল সেটা অবশ্য কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

'ফুলে-ভরা আপেল গাছের নিচ দিয়ে ঝোপের ভিতর থেকে কমলা-রঙের পোষাক পরা দু'জন লোককে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি হাসিহাসি মুখ করে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ইশারা করলাম। ওরা আমার কাছে এগিয়ে এল। ব্রোঞ্জের পাটাতনের দরজা দেখিয়ে আমি ওদের বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলাম যে আমি ওই দরজাটা খুলতে চাই। আমার ইশারায় ওরা অদ্ভুত ব্যবহার করল। জানি না কেমন করে ওদের ব্যবহারের কথা আপনাদের বোঝাবো। একজন সুন্দরী ও নরম মনের মহিলাকে কোন অশ্লীল প্রস্তাব করলে তিনি যেমন ব্যবহার করেন ওরাও কতকটা সেইরকম ব্যবহার করল। ওরা ছুটে পালিয়ে গেল, যেন কেউ ওদের চরম অপমান করেছে। এরপর আমি আর একজন সুন্দর-দেখতে মানুষকে আমার মনের ভাব বোঝাবার চেষ্টা

করাতে সেও আগেকার দুজনের মত পালিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরী হল। নিজেকে খুব ছোট মনে হল। কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারছেন কাল-যন্ত্রটার জন্য আমি তখন অনেক কিছু সহ্য করতে রাজি। আমি আর একবার ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করতেই সেও যখন পালাতে শুরু করল তখন আর আমি ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না। তিন লাফে এগিয়ে গিয়ে আমি লোকটার জামার কলার চেপে ধরলাম। তারপর ওকে স্ফিঙ্কসের দিকে টেনে নিয়ে এলাম। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বেশ চমকে উঠলাম। প্রচণ্ড ভয়ে লোকটার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখদুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। লোকটার এরকম অবস্থা দেখে আমার কেমন যেন মায়া হল। ওকে আমি ছেড়ে দিলাম।

'আমি তখনো হাল ছেড়ে দিইনি। ব্রোঞ্জের দরজায় প্রাণপণ শক্তিতে ঘুসি মারলাম। মনে হল ভিতরে কিছু একটা নড়ে উঠল— একটা শব্দ হল। তারপর মনে হল ওটা আমার মনের ভুল। এরপর আমি নদীর পাড় থেকে এক টুকরো বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেই পাথর দিয়ে দরজাটা ঠুকতে লাগলাম।'

'কারুকার্যগুলো চ্যাপ্টা হয়ে হয়ে খসে খসে পড়তে লাগল। লোক-গুলো নিশ্চয় আমার পাথর ঠোকার আওয়াজ পাচ্ছিল; কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না। নিচের দিকে আমি ওদের একটা দলকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওরা আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিল। অবশেষে, ঘেমে, নেয়ে ক্লান্ত হয়ে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। আমি অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম তাই কোনদিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছিল না।'

কিছুক্ষণ বাদে উঠে পড়ে অনির্দিষ্টভাবে ঝোপের মধ্যে দিয়ে আবার পাহাড়ের দিকে উঠতে লাগলাম। অধৈর্য হলে চলবে না। যন্ত্রটা পেতে হলে ওই স্ফিঙ্কসকে একা থাকতে দিতে হবে। আমার কাল-যন্ত্রটা ওরা দেবে না বলে নিয়ে থাকে তাহলে কিছুতেই কিছু করতে পারব না। তবে তা যদি না হয় তাহলে আমার প্রয়োজন মত ওটা হয়ত ফেরৎ পাব। এইসব অজানা জিনিসের মধ্যে, ধাঁধাঁর সামনে বসে থাকার

অর্থ হচ্ছে হতাশা। হতাশা থেকে আসে পাগলামী।

'বাস্তবের মুখোমুখি হতে হবে। একে দেখতে হবে জানতে হবে। তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। আমি নিজের মনে এসবই ভাবতে লাগলাম।—অবশেষে কোন সূত্র পেয়ে যেতেও পারি।

'হঠাৎ পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন ভাবে দেখা দিল। এই ভবিষ্যতে আসার জন্য আমি বছরের পর পরিশ্রম করেছি, পড়াশুনা করেছি আর এখন সেই ভবিষ্যৎ থেকে পালাবার জন্য আমি ছটফট করছি। আমি নিজেই অত্যন্ত জটিল ও বাজে একটা ফাঁদ তৈরী করেছি। যদিও জিনিসটা আমি নিজের পয়সা খরচা করে তৈরী করেছি তবু এর হাত থেকে আমার নিজেরও রেহাই নেই। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

'প্রাসাদটায় ঢুকে লক্ষ্য করলাম যে, লোকগুলো আমাকে যেন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। হয়ত এটা আমার কল্পনা অথবা পাথর দিয়ে সেই ব্রোঞ্জের পাটাতন ঠোকা এর জন্য দায়ী। যাহোক ব্যাপারটায় আমি খুব একটা বিচালত হলাম না। মনে হল দু'একদিনের মধ্যে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

'আমি ওদের ভাষাটা যতটা সম্ভব শিখতে চেষ্টা করলাম। আর এখানে-ওখানে আমার কাল যন্ত্রটা খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। এদের ভাষা নিতান্ত সহজ বলে মনে হলেও খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারছিলাম না। এদের বাক্যে মাত্র দুটি শব্দ। কাল-যন্ত্র ও ব্রোঞ্জের দরজার রহস্যের চিন্তাটা আমি মগজের এক পাশে ঠেলে রেখেছিলাম। তবু আমি যেখানে প্রথম এসে পৌঁছেছিলাম সেই লনের আশে-পাশে কয়েক মাইলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।'

'টেমস উপত্যকার এই অবস্থা আমি প্রায় সব জায়গায় দেখতে পেলাম। প্রত্যেক পাহাড়ের উপর থেকে যেদিকে তাকালাম সেদিকেই দেখতে পেলাম বিরাট বিরাট প্রাসাদ, তার এক একটার গড়ন ও কারু-কার্য এক এক রকম। মাঝে মাঝে সবুজ গাছগাছালি। তার ফাঁক

দিয়ে টেমসের জল রূপোর মত জ্বল জ্বল করছে। সেসব ছাড়িয়ে নীল পাহাড়ের সারি। তার পিছনে নীল আকাশ।'

'একটা জিনিস খুব বেশী করে চোখে পড়ল। গোল গোল কূয়ো। মনে হচ্ছিল কূয়োগুলো যথেষ্ট গভীর। প্রথম দিন পাহাড়ে ওঠার রাস্তার পাশে একটা এইরকম কূয়ো দেখেছিলাম। সবগুলোরই পাড় ব্রোঞ্জ দিয়ে বাঁধানো। আর মাথার উপরে একটা করে গোল ছাদ। কূয়োর মধ্যে উঁকি দিয়ে গভীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। না, জলের কোন চিহ্নই চোখে পড়ল না। এমনকি দেশাইয়ের কাঠি জ্বালানোর পরও কোন কিছু চিকমিক করে উঠল না। কিন্তু প্রত্যেক-টার মধ্যে আমি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম। দেশাইয়ের কাঠির আলোয় মনে হল একটা বাতাসের স্রোত যেন বয়ে চলেছে নিচের দিকে। আমি এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ ছুঁড়ে দিলাম কূয়োর মুখে। টুকরোটা কিন্তু ভাসতে ভাসতে নিচের দিকে নামল না। সাঁৎ করে নিচে নেমে গেল। মনে হল কাগজের টুকরোটাকে যেন টেনে নিল কিছুতে।'

'পরে এই কূয়োগুলোর সঙ্গে পাহাড়ের ঢালে বসানো লম্বা লম্বা চিমনীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে আমার কেমন যেন ধারণা হল। তার অবশ্য একটা কারণও আছে। এই চিমনীগুলোর মাথার উপরের বাতাসে মাঝে মাঝে এমন একটা চাঞ্চল্য আমার চোখে পড়েছে যা কোন গরমের দিনে সূর্যোকরোজ্জ্বল সৈকতে দেখা যায়। এই দুটো জিনিসের মধ্যে যোগাযোগ আছে মনে হতেই আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে মাটির নিচে হাওয়া চলাচলের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাপারটা মনে হতে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম।'

'আমি স্বীকার করছি যে আমি এই ভবিষ্যতের রাজ্যে যতদিন ছিলাম তার মধ্যে ওদের ময়লা নিষ্কাশনী ব্যবস্থা বা ওদের যানবাহন বা অন্যান্য ব্যাপার খুব অল্পই জানতে পেরেছিলাম। সাহিত্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেসব স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করা হয়েছে, সেখানে ঘরবাড়ি সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া আছে, তাদের সামাজিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি কথাও লেখা

আছে। কল্পনায় এরকম আলোচনা করা খুবই সহজ কাজ। সেখানে কোন বাস্তব পর্যটকের পায়ের ছাপ কোনদিন পড়বে না। সেণ্ট্রাল আফ্রিকার কোন নিগ্রো যদি লণ্ডন ঘুরে গিয়ে তার দেশের লোকের কাছে লণ্ডনের গল্প বলে তাহলে কি রকম হবে তা কল্পনা করুন। আমাদের রেলওয়ে ব্যবস্থা, সামাজিক আচার ব্যবহার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পার্শেল ডেলিভারী কোম্পানী, ডাক ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে সে কতটুকু জানতে পারবে? যদিও এসব ব্যাপার সম্বন্ধে সবকিছু বলবার ও ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা ইচ্ছুক। তবুও সে সবকিছু বুঝে উঠতে পারবে না। তার দেশের মানুষদের কাছে সে যতটুকু বুঝবে তার কতটুকু বোঝাতে বা বিশ্বাস করাতে পারবে? আমাদের নিজেদের কালে একটা নিগ্রো ও একটা সাদা মানুষের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? অথচ আমার ও ভবিষ্যতের এই স্বর্ণযুগের মধ্যে পার্থক্য কি দুস্তর! অনেক কিছু আমার দেখা হয়ে ওঠেনি। তবু একটা স্বয়ংক্রিয় সংস্থার অস্তিত্বের অভাবের বেশী আমি আপনাদের আর বেশী কিছুই দিতে পারব না।'

শবদেহ সৎকারের কথাই ধরা যাক। আমি কোন শ্মশান বা গোরস্থান কিছুই দেখতে পাইনি। কিন্তু আমার মনে হয়েছে কোথাও না কোথাও শ্মশান বা গোরস্থান হয়ত আছে যেখানে আমি যাইনি। বার বার কথাটা আমার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে এসেছে, তার কারণ আরো একটা রহস্যময় ব্যাপার আমার নজরে পড়েছে, তা হচ্ছে ওদের মধ্যে কোন অক্ষম বা বয়স্ক মানুষ নেই। এরা সবাই যেন অনন্ত যৌবনের অধিকারী।

'আমি স্বীকার করছি যে আমার আগেকার স্বয়ংক্রিয় সভ্যতা ও এদের দৈহিক অক্ষমতার যে তত্ত্ব আমি খাড়া করেছিলাম তা অচিরে ভেঙে গেল। কিন্তু অন্য কোন তত্ত্বও আমি খাড়া করতে পারলাম না। অসুবিধেটা কি তা বলছি। যে বড় বড় প্রাসাদগুলোর মধ্যে আমি ঘোরাফেরা করেছি সেগুলো সবই থাকবার জায়গা, বড় বড় খাবার হলঘর

ও শোয়ার ঘর। আমি সেসব প্রাসাদের মধ্যে কোন যন্ত্রপাতি বা অস্ত্র কোন কিছু দেখতে পাইনি। তবু এই লোকগুলো খুব সুন্দর সুন্দর পোষাক পরে ঘুরছিল। এসব পোষাক নিশ্চয় একসময় ছিঁড়ে যায়, তখন নতুন পোষাকের প্রয়োজন হয়। ওদের চটি, যদিও কারুকার্য হীন তবুও সেগুলো জটিল ধাতুর কাজের নমুনা। নিশ্চয় এসব জিনিস কোথাও না কোথাও না তৈরী হয়। অথচ এই খুদে জীব গুলোর কোন সৃষ্টিশীল দক্ষতা আছে বলে আমার মনে হয় নি। এখানে কোন দোকান নেই, কোন কারখানা নেই, অন্য কোথাও থেকে এগুলো আমদানীকরা হয় বলেও আমার মনে হল না। এরা সব সময় খেলাধূলো করে, নদীতে স্নান করে, ভালবাসাবাসি করে, ফলমূল খেয়ে আর ঘুমিয়ে সময় কাটায়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না সব ঠিকঠাক ভাবে চলছে কি করে ?

'তারপর কাল যন্ত্রের ব্যাপারটা : আমি জানি না কি করে ওটাকে স্ফিঙ্কসের ফাঁপা পাটাতনের মধ্যে নিয়ে গেল!' আর কেনই বা নিয়ে গেল ? সারাজীবন ধরে ভাবলেও এর উত্তর খুঁজে পাব বলে মনে হয় না। জলহীন কূয়ো, বাষ্পওঠা চিমনী এ সবই আমার কাছে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। ব্যাপারটা এভাবে বলা চলে যে আপনি একটা শিলালিপি খুঁজে পেলেন যার এখানে ওখানে আপনার খুব পরিচিত শব্দ বসানো কিন্তু সেই শব্দগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এমন শব্দ বসানো যা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। জানা-অজানা সব রহস্যময়। পরিবেশে আপনি বিমূঢ়। যাহোক তৃতীয় দিনে এই ভবিষ্যতের জগত আমার সামনে আর এক বিস্ময় তুলে ধরল।

'সেদিন আমি একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালাম। ব্যাপারটা এই ভাবে ঘটল। সেদিন আমি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওদের একটা দলের স্নানকরা দেখছিলাম। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজনের পায়ে খিচ ধরল ও সে নদীর স্রোতে ভেসে চলল। নদীর স্রোত বেশ জোরে বইছিল, তবে যে কোন সাধারণ সাঁতারু তাতে সাঁতার দিতে পারে। এই ঘটনা

থেকে আপনারা এই খুদে জীবগুলোর বিচিত্র ব্যবহারের কথা বুঝতে পারবেন। আশ্চর্যের ব্যাপার যে লোকটাকে উদ্ধার করার জন্য কেউ এগিয়ে গেল না। লোকটা ওদের চোখের সামনে ডুবে মরতে চলেছে। আর বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি তাড়াতাড়ি জামা খুলে জলে নেমে পড়লাম। আমি লোকটিকে ধরে ফেলে টানতে টানতে ডাঙায় উঠে এলাম। একটু চাপড়াতেই ও সুস্থ হয়ে উঠল। দেখলাম ও একটি মেয়ে। এদের সম্বন্ধে আমার এমনই একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে এদের কাছে কোন কৃতজ্ঞতার আশা করিনি। কিন্তু আমার ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হল।

'ব্যাপারটা ঘটেছিল সকালবেলা। বিকেলে আমি যখন চারিদিকে ঘুরে ফিরে আসছিলাম তখন হঠাৎ সেই মেয়েটির সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়ে গেল। আনন্দে চিৎকার করে ও আমাকে স্বাগত জানালো ও একটা বিরাট ফুলের মালা আমাকে দিল। মালাটা যে আমার জন্যেই তৈরী করা হয়েছে তা বুঝতে আমার এতটুকু অসুবিধে হল না। ব্যাপারটায় আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। যা হোক উপহারটা পেয়ে যে আমি খুশী হয়েছি তা জানাতে আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। তারপর আমরা দুজনে একটা পাথরের উপর বসে কথাবার্তা বলতে শুরু করলাম। অবশ্য তার বেশীরভাগটাই হাসাহাসি। এই খুদে জীবটার বন্ধুত্ব আমার মনকে বেশ নাড়া দিল ; যেভাবে একটা শিশুর বন্ধুত্ব আমার মনকে নাড়া দিত ঠিক সেই ভাবে। আমরা পরস্পরকে ফুল দেওয়া নেওয়া করলাম। ও আমার হাতে চুমু খেল। আমিও ওর হাতে চুমু খেলাম। তারপর আমি আবার কথাবার্তা শুরু করলাম। পরে জানতে পারলাম ওর নাম উইনা। যদিও নামের অর্থ আমার কাছে বোধগম্য নয়, তবু মনে হল নামটা বেশ ভাল। এক বিচিত্র বন্ধুত্বের সেই হল শুরু। এ বন্ধুত্ব প্রায় এক সপ্তাহ ধরে টিকে ছিল, তারপর তা নষ্ট হয়ে যায়—সে কথায় পরে আসছি। ও একেবারে শিশুর মত। সব সময় আমার সঙ্গে থাকতে চাইত। সব সময় আমার পিছনে পিছনে ঘুরে

বেড়াতে ভালবাসত। সমস্যার মুখোমুখি হতেই হবে। আমি এই ভবিষ্যতের রাজ্যে প্রেম করতে আসিনি। কিন্তু যখন ওকে ফেলে এলাম তখন ওর দুঃখ আমাকেও কিছুটা ভাগ করে নিতে হয়েছিল। মেয়েটি মূর্তিমতি শান্তি। আমার মনে হয়েছিল এ একটা ছেলেমানুষী আকর্ষণ। ওকে ছেড়ে আসার অনেক পরে বুঝেছিলাম কি আঘাত আমি ওকে দিয়েছি। আরো বুঝেছিলাম ও আমার কতখানি। কারণ যদিও ওকে ছেড়ে স্ফিঙ্কসের কাছে ফিরে এসে আমার মনে হচ্ছিল আমি নিজের বাড়ি পৌঁছে গেছি; কিন্তু তারপর আবার পাহাড়ের উপর ছুটে গিয়ে ওর সেই ছোট্ট সোনালী চেহারাটা খুঁজে বেড়িয়েছি। ওর কাছ থেকে আমি শিখলাম যে ভয় এখনো পৃথিবার বুক থেকে মুছে যায় নি। দিনের বেলায় ও খুব সাহসী। আমার উপর ওর দারুণ আস্থা, কারণ একবার আমি বোকার মত ওকে ভয় দেখিয়েছিলাম; কিন্তু ও শুধু হেসেছিল। কিন্তু ও অন্ধকারকে ভয় পায়। ছায়া ও কালো জিনিস দেখলে আঁতকে ওঠে। অন্ধকারকে ও কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ভাবতে লাগলাম। এরপর আমার নজরে পড়ল যে এই লোকগুলো অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে জড়ো হয়। একসঙ্গে দল বেঁধে ঘুমোয়। অন্ধকার নামার পর একটা লোক-কেও আমি ঘরের বাইরে থাকতে দেখিনি, অথবা ঘরের মধ্যে কাউকে একা ঘুমুতে দেখিনি। অথচ আমি এতই মাথামোটা যে একবারও এই ভয়ের কারণ বুঝতে চেষ্টা করিনি। উইনার বারণ সত্বেও আমি দল ছাড়া হয়ে ঘুমুতে চেয়েছি।

ব্যাপারটা ওকে যথেষ্ঠ উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। যাহোক শেষ পর্যন্ত ওর ওই বিচিত্র ভালবাসারই জয় হল। ওর সঙ্গে পরিচিত হবার পর পাঁচ রাত্রি, এমনকি শেষ রাত্রিতেও ও আমার হাতটাকে বালিশের মত ব্যবহার করে ঘুমিয়েছে। ওর সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি আসল গল্পের খেই হারিয়ে ফেলব।

'উইনাকে উদ্ধার করার আগের দিন রাত্রিবেলা হঠাৎ আমার ঘুম

ভেঙে গিয়েছিল। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি ডুবে যাচ্ছি, আর সমুদ্র শ্যাওলারা ওদের লম্বা লম্বা নরম শুঁড় আমার সাড়া মুখে বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি লাফিয়ে উঠেছিলাম। ঘুম ভাঙতেই মনে হয়েছিল যেন ধূসর রঙের কোন জন্তু ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু ঘুম এলো না। এ হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত যখন ভয়াবহ সব জিনিস হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসে। যখন সব জিনিসই রঙহীন কালো, আর অশরীরি। আমি উঠে পড়লাম, তারপর বড় হল ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর হলঘর ছাড়িয়ে প্রাসাদের সামনে ফ্লাগস্টোনটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হল আমি সূর্যোদয় দেখার পুণ্য অর্জন করে ফেলব।

'চাঁদ অস্তমিত। মরা চাঁদের আলো প্রথম উষার আলোর সঙ্গে মিলেমিশে একটা অস্পষ্ট ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ঝোপঝাড়-গুলো দোয়াতের কালির মত ঘন কালো। মাঠঘাট ধূসর আবছা—। আকাশ কালো। মনে হল এখন পাহাড়ের দিকে তাকালেই অশরীরি জীবদের দেখতে পাব। মনে হল পাহাড়ের খাদে আমি তিনবার সাদা চেহারার কিছু দেখতে পেলাম। দুবার যেন একটা সাদা বাঁদরের মত কোন জন্তুকে লাফিয়ে লাফিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে যেতে দেখলাম। একবার ধ্বংসাবশেষের কাছে দেখতে পেলাম ওরা একটা কালো কিছু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা খুব তাড়াতাড়ি আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। কোনদিকে গেল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হল ওরা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। ভোরের ঠাণ্ডায় আমার শরীর জমে আসছিল। মনে হল এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। নিজের চোখকেও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না।

'পূবের আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উষার আলো রাঙিয়ে দিল পৃথিবীকে। আমি এবার জায়গাটা ভালো করে খুঁজে দেখলাম ; কিন্তু

সেই সাদা চেহারার জন্তুগুলোকে দেখতে পেলাম না। ওরা অন্ধকারের জীব। অশরীরি কিছু হবে হয়ত। সারা সকাল আমি ওদের কথা ভেবেছি, তারপর উইনাকে উদ্ধার করার পর থেকে সব ভুলে গিয়েছি।

'আমাদের সময় থেকে এই ভবিষ্যতের পৃথিবী অনেক বেশী গরম। কারণ কি তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। হয়ত সূর্য আরো গরম হয়ে উঠেছে, অথবা পৃথিবী সূর্যের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে সূর্য একদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা অনেকে খেয়াল করেন না তা হল এই যে সমস্ত গ্রহ একে একে সূর্যের বুকে লীন হয়ে যাবে। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটার পর সূর্য আবার নতুন তেজে জ্বলে উঠবে।

'যাহোক একদিন সকাল বেলা রোদ ও গরমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে একটা বিরাট পোড়ো ভাঙা বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলাম। যে বড় প্রাসাদটায় আমি খাওয়াদাওয়া করেছিলাম ও ঘুমিয়েছিলাম এই ধ্বংসাবশেষটা ছিল তার খুব কাছে। আর সেখানেই ব্যাপারটা ঘটল। ঘুরতে ঘুরতে একটা সরু লম্বা বারান্দা দেখতে পেলাম। বারান্দার দুই পাশের জানালা ও শেষপ্রান্তের দরজার মুখে পাথর পড়ে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরের আলো থেকে এখানে ঢুকে পড়াতে বারান্দাটা ভীষণ অন্ধকার বলে মনে হল আমার কাছে। আমি হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ আলো থেকে অন্ধকারে চলে আসার জন্য আমার চোখের সামনে যেন বিভিন্ন রঙের বুদ্বুদ ভাসতে লাগল। হঠাৎ আমি চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একজোড়া জ্বলন্ত চোখ সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে।

'মনে হল কোন বুনো হিংস্র জন্তুর চোখ। আমি হাত মুঠো করে বিমূঢ়ের মত-সেই জ্বলন্ত চোখ দেখতে লাগলাম। ভয়ে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিলাম না। তারপর নিজের নিরাপত্তার কথা মনে হল। মনে পড়ল অন্ধকারের সেই জীবদের কথা যাদের আমি চকিতে দেখেছিলাম। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে একপা এগিয়ে গেলাম ও কথা বলে উঠলাম। আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে ভয়ে

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল আর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। হাত বাড়াতেই নরমমত কিছু আমার হাতে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চোখদুটো ঘুরে গেল ও সাদা মত কী একটা আমাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল! আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। একটা ছোট বাঁদরের মত চেহারার বিচিত্র এক জন্তুকে দেখতে পেলাম। সামনের আলোকিত জায়গাটা দিয়ে ওটা ছুটে পালাচ্ছে। একটা বড় গ্রানাইট পাথরের পাশ দিয়ে মুহুর্তের মধ্যে দূরের আর একটা ধ্বংসাবশেষের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ল ওটা।

'জন্তুটা কি তা না চিনতে পারলেও এটা বুঝতে পারলাম জন্তুটা ছাই রঙের। ধূসর লাল বড়বড় চোখ, মাথায় ও বুকে পিঠে বড়বড় লোম রয়েছে। তবে আগেই বলেছি ভাল করে দেখবার আগেই জন্তুটা আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না জন্তুটা চারপায়ে ভরদিয়ে ছুটে গিয়েছিল নাকি সামনের পা মানুষের হাতের মত কাঁধের দুপাশে ঝুলিয়ে ছুটে পালিয়েছিল। আমার হতবম্ভ ভাবটা কেটে যেতেই সামনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমি ছুটে গিয়েছিলাম। প্রথমে ওটাকে আমি দেখতে পাই নি। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে আবছা আলোয় আমি একটা কূয়োর মুখ দেখতে পেলাম। এই কূয়োর কথা আপনাদের আমি আগেই বলেছি। থাম পড়ে কূয়োর মুখটা অর্দ্ধেক বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হল। জন্তুটা কি এই পথে পালিয়েছে? আমি একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বালালাম। কূয়োর মধ্যে তাকাতে একটা ছোট সাদা জন্তুকে নড়াচড়া করতে দেখতে পেলাম। জন্তুটা পালাচ্ছে; কিন্তু ওর লাল চোখের দৃষ্টি আমার উপরে। ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। যেন একটা মানুষ-মাকড়সা চলে বেড়াচ্ছে! কূয়োর দেওয়াল বয়ে ওটা নেমে যাচ্ছে। এই প্রথমবার আমার চোখে পড়ল কূয়োর দেওয়ালে ধাতব হাতল বসানো রয়েছে ওটা নামার জন্য, অনেকটা সিঁড়ির মত। আগুনের ছ্যাঁকা লাগতেই আমি দেশলাইএর কাঠিটা ছেড়ে দিলাম, আর ওটা কূয়োর মধ্যে গিয়ে পড়ল। আর একটা

কাঠি জ্বালালাম কিন্তু ততক্ষণে সেই জীবন্ত দানবটা অদৃশ্য হয়েছে।

জানি না কতক্ষণ সেই কূয়োর মধ্যে তাকিয়ে বসে ছিলাম। ওই জন্তুটা যে মানুষ হতে পারে তা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু আস্তে আস্তে সত্য আত্মপ্রকাশ করল। বুঝতে পারলাম মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিবর্তন ঘটে গেছে। তারা-দুটো বিশিষ্ট ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। উপরের মানুষরাই আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নয়। এই কিম্ভুত কিমাকার অন্ধকারের জীব গুলোও সমান উত্তরাধিকারী।

বাষ্প ওঠা চিমনী যা দেখে আমি মাটির নিচে বসবাস আছে ভেবে-ছিলাম তা এবার সত্যি বলে মনে হল।

আমি যে সমাজ ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলাম সেখানে এই বাঁদর-মানুষদের ভূমিকা কি ? উপরের জগতের মানুষদের সঙ্গে নিচের মানুষদের সম্পর্ক কি ? নিচে কি লুকোনো রয়েছে কে জানে ? আমি কূয়োর পাড়ে বসে বসে ভাবতে লাগলাম আর যাই হোক ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। নিচে কি আছে তা জানার জন্য আমাকে কূয়োর মধ্যে নামতেই হবে। মনে মনে ভাবলেও সত্যি সত্যি কূয়োর মধ্যে নামতে আমার যথেষ্ট ভয় করছিল। আমি যখন ইতস্তত: করছিলাম ঠিক সেই সময় দুজন উপরের মানুষ ছুটতে ছুটতে রোদ থেকে ছায়ায় এসে দাঁড়াল। দৌড়ে আসার সময় পুরুষটি মেয়েটার গায়ে ফুল ছুড়ছিল।

'আমাকে থাম ধরে কুয়োর মধ্যে তাকিয়ে থাকতে দেখে ওরা একটু অপ্রস্তুত হ'ল। কারণ কুয়োর মধ্যে তাকানো ব্যাপারটা ওরা মোটেও সুনজরে দেখল না। তাই আমি যখন কুয়োটা দেখিয়ে ওদের ভাষায় প্রশ্ন করলাম তখন ওরা ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল ও আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু ওরা আমার দেশলাই জ্বালা দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। আমি বেশ কয়েকটা কাঠি জ্বেলে ওদের দেখালাম। তারপর আবার আমি ওদের কাছে কুয়োর ব্যাপারটা জানতে চাইলাম কিন্তু আমি কোন জবাব পেলাম না। অগত্যা আমি

ওদের ফেলে রেখে উইনার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম দেখি উইনার কাছ থেকে কিছু জানতে পারি কিনা? আমার চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল। আমার আগেকার সিদ্ধান্ত ও ধারণা একের পর এক বদলে যাচ্ছে। কুয়োর রহস্য কিছুটা এখন আমার কাছে স্পষ্ট। হাওয়া চলাচল করা চিমনী, অশরীরিদের রহস্যও সহজ হয়ে এসেছে। কিন্তু পিতলের দরজা আর আমার কাল যন্ত্রের রহস্য যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই রয়েছে।

'এখানে এ এক নতুন দৃশ্য! এই দু নম্বর মানুষরা মাটির নিচে বসবাসকারী। তিনটে ব্যাপারে আমি বুঝতে পারলাম যে এই জীবগুলো বহুদিন ধরে মাটির নিচে বসবাস করছে আর সেই জন্যেই চট করে এরা বাইরের জগতে আসতে চায় না। প্রথমতঃ, যে সমস্ত জীব অন্ধকারে বাস করে সাধারণতঃ তাদের গায়ের রঙ হয় সাদাটে যেমন কেণ্টাকী গুহার সাদা মাছ। দ্বিতীয়তঃ, বড় বড় চোখ, আর আলো প্রতিফলিত করার বিশেষ ক্ষমতা অন্ধকারের জীবদেরই থাকে যেমন পেঁচা। আর তৃতীয়তঃ, সূর্যের আলো সহ্য করতে না পারা। যেভাবে ওই জীবটি ছুটে গিয়ে অন্ধকারে আশ্রয় নিল তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম ওদের চোখের মণি অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

'তাহলে আমার পায়ের নিচে মাটির মধ্যে প্রচুর সুড়ঙ্গ আছে। আর এই নতুন মানুষরা সেই সব সুড়ঙ্গের বাসিন্দা। হাওয়া চলাচল করার চিমনী ও কুয়ো গুলো ছড়িয়ে আছে পাহাড়ের ঢালে। নদীর পাড়ের সমতল ভূমিতে কিন্তু এগুলো দেখা যায় না। এগুলো দেখলেই বোঝা যায় মাটির নিচের সুড়ঙ্গ গুলো কত শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছে। তাহলে কি মাটির নিচের এই কৃত্রিম জগতে উপরের বাসিন্দাদের আরামের জন্য যা দরকার তা উৎপন্ন হয়? ধারণাটা সঠিক বলেই মনে হল। আমি ভাবতে লাগলাম কিভাবে দুটো বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল? আপনারা আমার তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবতেও পারবেন না। কিন্তু পরে মনে হল আমার তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের আকাশ-পাতাল ফারাক।

'আমাদের নিজেদের জগৎ থেকে শুরু করা যাক। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের কালে তাই হয়ত বাড়তে বাড়তে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমি জানি এ ধরণের তত্ত্বের কথায় আপনারা নাক সিঁটকোবেন। মাটির তলায় যেসব জিনিস তৈরী করা হয় তা খুব একটা বাহারে হয় না তবে সেগুলো খুবই প্রয়োজনীয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লণ্ডনের মেট্রোপলিটান রেলওয়ে, এখন নতুন বৈদ্যুতিক রেল হয়েছে, সাব-ওয়ে, ছোট ছোট কাজকর্মের জায়গা, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। আর এসব জিনিস দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং আমি ভেবেছিলাম, জিনিসটা বর্তমানে আরো বেড়ে গেছে। অর্থাৎ মাটির নিচে এখন বহু বড় বড় কারখানা তৈরী হয়েছে। কর্মীরা এখন বেশীরভাগ সময় মাটির নিচে কাটাচ্ছে। বর্তমানে ইস্ট-এণ্ড এর কর্মচারীরা এমন একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে বাস করছে না কি? পৃথিবী পৃষ্ঠের স্বাভাবিক আবহাওয়া যেখানে নেই বললেই চলে।

'তাছাড়া বড়লোকেরা তাদের উচ্চতর শিক্ষাদীক্ষার ফলে এবং তাদের ও গরীবলোকদের মধ্যেকার বিরাট ফারাকের জন্য ভূ-পৃষ্ঠের বেশীরভাগ জায়গা নিজেদের দখলে এনে ফেলেছে। লণ্ডনের কথাই ধরা যাক। ভাল এলাকার অর্দ্ধেকটাই অনধিকারীদের দখলে চলে গেছে। সবশেষে ভূপৃষ্ঠের উপরে বাস করবে ধনীরা। উপভোগ করবে আনন্দ, সুখ আর সৌন্দর্য্য আর মাটির নিচে গরীব শ্রমজীবিরা আস্তে আস্তে থাকতে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হবে। নিচে থাকলেও ঘর ভাড়া দিতে হবে, যদি না দেয় তাহলে দমবন্ধ হয়ে মরবে। যারা বিদ্রোহ করবে ও এ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না তারা মরবে। যারা বেঁচে যাবে, তারা এই সুড়ঙ্গ জীবনে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। তারাও উপরের মানুষদের মতই এই অন্ধকার সুড়ঙ্গে সুখী হবে।

'মনুষ্যত্বের বিজয় কেতন! আমি যে স্বপ্ন দেখতাম তা এখন আমার মনে অন্য রূপ নিতে শুরু করল। উপরের বাসিন্দাদের অতি-সাবধানতা তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করে নি; কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের চেহারা,

শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি কমিয়ে এনেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নিচের বাসিন্দাদের কি হয়েছে তা অবশ্য আমি এখনো সঠিক জানি না তবে, 'মরলোক'দের যেভাবে দেখেছি—হ্যাঁ বলতে ভুলে গিয়েছি মাটির নিচের ওই জীবগুলোকে 'মরলোক' বলে ওরা। আমি কল্পনা করতে পারছি যে মানুষের চেহারার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যা উপরের বাসিন্দা বা 'ইলোই' দের ক্ষেত্রে ঘটে নি।

'তারপরই আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। ওই 'মরলোক'রা আমার কাল-যন্ত্রটাকে নিয়ে গেল কেন? আমার মন বলছিল যন্ত্রটা ওরাই সরিয়েছে। তাহলে এই 'ইলোই', যারা এ জগতে ধনী বা প্রভুর ভূমিকা নিয়েছে তারা আমার কাল-যন্ত্রটা ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারছে না কেন? কেনই বা ওরা তাহলে অন্ধকারকে এত ভয় পায়? আমি উইনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম। কিন্তু আবার আমাকে হতাশা হতে হয়েছিল। প্রথমে উইনাতো আমার প্রশ্নটাই বুঝতে পারে নি। উইনা ভয়ে কাঁপতে লাগল, যেন আমি ভয়ঙ্কর কিছু একটা বলে ফেলেছি। কিন্তু আমি যখন চাপাচাপি করলাম তখন ও স্রেফ কেঁদে ফেলল। আমার নিজের চোখের জল ছাড়া একমাত্র উইনার চোখে. জল দেখেছিলাম এই স্বর্ণযুগে। উইনার চোখে জল দেখে আমি 'মরলোক'দের কথা আর তুললাম না। আমি উইনার চোখের জল মুছিয়ে দিলাম। উইনা খুশী হয়ে হাসল ও হাততালি দিয়ে উঠল। আমি একটা দেশলাইএর কাঠি জ্বালালাম।

ছয়

'আপনাদের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে কিন্তু দুদিন পরে আমি নতুন পাওয়া সূত্র নাড়াচাড়া করে বুঝতে পারলাম আসল ব্যাপারটা কি ? ওই নোংরা জীবগুলোকে স্পর্শ করতে আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠল। পোকার মত সাদা দেহ। স্পিরিটের মধ্যে ডুবিয়ে যাদুঘরে রাখা জিনিসের মত, বিশ্রী ঠাণ্ডা ওদের দেহ। হয়ত 'ইলোই'দের ঘৃণা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল।

'পরের দিন রাতে ভাল করে ঘুমুতে পারলাম না। হয়ত আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। সন্দেহ ও বিরক্তিতে আমার মন ভরে ছিল। একবার অথবা দুবার আমার মনটা আতঙ্কে শিউরে উঠল অথচ ভয় পাওয়ার মত সেরকম কোন কারণ ছিল না। আমি বেশ মনে করতে পারছি যে আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে বিরাট হলঘরটায় চলে এসেছিলাম। ওই হলঘরে ওরা শুয়ে ছিল। ওদের মধ্যে উইনাকে দেখতে পেয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে অমাবস্যার অন্ধকার নামবে তখন নিচের অস্বস্তিকর জীবগুলো উপরে উঠে আসবে দলে দলে। সেই সময় আমাকে একটা কঠিন কর্তব্য পালন করতে হবে। কাল-যন্ত্রটাকে যদি উদ্ধার করতে হয় তবে সেই হবে উপযুক্ত সময়। আমাকে সাহসে ভর করে সেই সময় মাটির তলার রহস্য হাঁতরে দেখতে হবে। কিন্তু আমি কি সে রহস্যের মুখোমুখি হতে পারব ? একজন সঙ্গী থাকলে খুব ভাল হত। কিন্তু আমি একা। জানি না আপনারা আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন কি না, কিন্তু আমি কোন সময়ই নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পায়ছিলাম না।

'এই অনিশ্চয়তা ও ভয় আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছিল।

একদিন আমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড়ে গিয়েছিলাম। এখন জায়গাটাকে কম্ব অরণ্য বলা হয়। দূরে একটা বিরাট সবুজ রঙের বাড়ির মত কিছু একটা দেখতে পেলাম। এতদিন যা দেখেছি তার সঙ্গে এটার কোন মিল ছিল না। বড় প্রাসাদ বা ধ্বংসস্তূপের থেকেও এটা অনেক বড়। যেন প্রাচ্য রীতিতে তৈরী ওটা। সামনের দিকটা বেশ উজ্জ্বল। চাপা সবুজ রঙ। নীলচে সবুজ চীনা মাটির তৈরী বলে মনে হল আমার। এরকম অদ্ভুত বাড়ির ভিতরে কি আছে তা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠলাম ও ভিতরে যাব বলে ঠিক করে ফেললাম। কিন্তু তখন সন্ধ্যা নেমে আসছিলো। আর সারাদিন ঘোরাঘুরির পর আমিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই ঠিক করলাম আগামীকাল আমার অভিযান শুরু করব। আমি উইনার কাছে ফিরে এলাম। কিন্তু পরদিন সকালে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে সবুজ চীনেমাটির প্রাসাদ সম্বন্ধে আমার অতিরিক্ত কৌতূহল আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু না। আসলে আমি নিচে নামতে ভয় পাচ্ছি বলে সময় নষ্ট না করে আমি নিচে নামব। গ্রানাইট ও এ্যালুমিনিয়ামের ধ্বংসস্তূপের দিকে আমি তক্ষুণি রওনা হলাম।

'উইনা আমার পিছনে ছুটতে ছুটতে এলো। আমার পাশে নাচতে নাচতে কুয়ো পর্যন্ত পৌঁছলো। কিন্তু ও যখন দেখল যে আমি কুয়োর মুখে ঝুঁকে নিচের দিকে দেখতে চেষ্টা করেছি তখন ও মুখ কালো করে ঘুরে দাঁড়ালো। আমি ওকে চুমু খেয়ে বললাম,—বিদায় উইনা। তারপর ওকে সরিয়ে দিয়ে কুয়োর দেওয়ালে লোহার হুক গুলো হাঁতড়াতে লাগলাম। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি করলাম, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে নিচে নামার সাহস হয়ত বেশীক্ষণ আমার মধ্যে থাকবে না। প্রথমে উইনা খুব অবাক হয়ে আমার কাজ দেখছিল। তারপর একটা করুণ চিৎকার করে ও আমার কাছে ছুটে এলো। ওর ছোট্ট হাতদুটো দিয়ে ও আমাকে টেনে তোলার চেষ্টা করতে লাগল। উইনার বাধা আমার সাহস বাড়িয়ে দিল। আমি একটু কঠিন ভাবেই ওকে ঠেলে

সরিয়ে দিলাম, তারপর খুব তাড়াতাড়ি কূয়োর মধ্যে নামতে শুরু করলাম। উপরের দিকে তাকাতেই উইনার উদ্বিগ্ন মুখখানা দেখতে পেলাম। ওকে ভরসা দেওয়ার জন্য আমি একটু হাসলাম। তারপর আমি লোহার হুকগুলোর দিকে মনোযোগী হয়ে পড়লাম'।

'প্রায় দুশোগজ আমাকে কূয়োর দেওয়ালে বসানো লোহার হুক ধরে ধরে নামতে হবে। হুক গুলো 'মরলোক'দের সুবিধের জন্য বসানো, আমার পক্ষে এগুলো ধরে নামা খুব কষ্টকর হচ্ছিল। তাছাড়া হুকগুলো এত হাল্কা যে আমার ভয় হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে এর যে কোন একটা ভেঙে পড়তে পারে। খুব শীঘ্রিই আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শুধু ক্লান্তই নই হঠাৎ একটা হুক বেঁকে গেল আমার ভারে। আর একটু হলে আমি ছিটকে নিচে পড়ে যেতাম। কোনরকমে একহাতে ঝুলতে লাগলাম। এরপর আর কোন জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামতে সাহস করিনি। যদিও আমার দুইহাত পিঠ ও কোমর যন্ত্রণায় টনটন করছিল তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি নিচে নামতে লাগলাম। উপরের দিকে তাকাতে কূয়োর মুখটাকে মনে হল একটা ছোট্ট নীল গোল ডিশ। আর সেই ডিশের একপাশে উইনার মাথাটা একটা ছোট্ট কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল। নিচ থেকে একটা যন্ত্র চলার শব্দ পাচ্ছিলাম। উপরের কূয়োর মুখের আলোটুকু ছাড়া আর সব কিছু ঘন অন্ধকারে ঢাকা। পরে আবার যখন আমি উপরেব দিকে তাকালাম তখন আর উইনার মাথা কূয়োর মুখে দেখতে পেলাম না।

একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি উঠে যাই। কিন্তু মনে মনে ভাবলেও আমি হুক ধরে নেমে চলেছিলাম। অবশেষে আমার ডানপাশে ফুটখানেক দূরে দেওয়ালে একটা গর্ত দেখতে পেলাম। ঝুঁকে গর্তটার ভিতর উঁকি মারলাম। আবছা অন্ধকারে মনে হল ওটা একটা সরু সুড়ঙ্গ। ওটার মধ্যে দিব্বি কিছুক্ষণ আমি শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারি। আমার হাত ব্যথা করছিল, পিঠে যন্ত্রণা হচ্ছিল আর আমি পড়ে যাওয়ার ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তাছাড়া এই

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আমার চোখে যন্ত্রণা হচ্ছিল। গর্তের ভিতর দিয়ে বাতাস টেনে নেবার শব্দ ও যন্ত্রপাতির শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।

'কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম বলতে পারব না। হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। একটা নরম হাত আমার মুখের উপর কেউ বুলিয়ে দিচ্ছে। সেই অন্ধকারে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালালাম। দেখলাম উপরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে রকম প্রাণী দেখে ছিলাম সেই রকম তিনটে প্রাণী আলো দেখে ছুটে পালাচ্ছে। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বাস করার জন্য ওদের চোখগুলো অস্বাভাবিক রকমের বড় বড় ও খুব স্পর্শকাতর। আমি বুঝতে পারলাম ওই অন্ধকারের মধ্যেও ওরা আমাকে দেখতে পাচ্ছে। ওরা আমাকে ভয় পায় নি, অবশ্য দেশলাইটা ছাড়া। কিন্তু আমার দেশলাই কাঠি জ্বালাবার সময়টুকুর মধ্যে ওরা দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওদের চোখগুলো অদ্ভুতভাবে জ্বলতে লাগল।

'আমি ওদের ডাকলাম। কিন্তু মনে হল ওদের ভাষা উপরের 'ইলোই'দের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমি আমার সাধ্যমত ভাবে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তখনো আমি মনে মনে অভিযান পরিত্যাগ করে উপরে পালাবার কথা ভাবছিলাম। ভাবলাম সবকিছু আমাকে জানতে হবে। আমি সুড়ঙ্গের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। যন্ত্রপাতির শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। হঠাৎ আমার চারপাশের দেওয়াল মিলিয়ে গেল। আমি একটা প্রশস্ত জায়গায় এসে পড়লাম। দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে দেখতে পেলাম একটা মস্ত খিলান দেওয়া গুহার মধ্যে এসে পড়েছি। দেশলাই কাঠির আলোর বাইরেও এর পরিধি বিস্তৃত। ওই আলোটুকুর সাহায্যে ওই বিরাট গুহার খুব সামান্য অংশই আমি দেখতে পেলাম।

'আমার স্মৃতি খুবই ঝাপসা। সেই অন্ধকারে বিরাট বিরাট

যন্ত্রের আবছা আভাস আমি পাচ্ছিলাম। সেই যন্ত্রপাতির আড়ালে 'মরলোক'রা দাঁড়িয়েছিল। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি—জায়গাটায় যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বাতাসে যেন তাজা রক্তের গন্ধ পাচ্ছিলাম। গুহার অভ্যন্তরে সাদা ধাতুর একটা টেবিল ছিল। আর টেবিলের উপর কিছু জিনিস সাজানো ছিল। কোন খাবার-দাবার বলেই আমার মনে হচ্ছিল। এই 'মরলোক'রা মাংসাসী। সবকিছুই অস্পষ্ট ও ঝাপসা। তীব্র গন্ধ, বিরাট বিরাট অপরিচিত চেহারা, সেই আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিশ্রী জীবগুলো, সব যেন আমাকে ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষা করছিল নিঃশব্দে। আমার হাতের দেশলাই-এর কাঠি পুড়ে গিয়ে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই আমি কাঠিটা ফেলে দিলাম। একটা লাল বিন্দুকে অন্ধকার গ্রাস করল।'

'আমি অনেকক্ষণ থেকে ভাবছিলাম যে এ ধরণের অভিযানের জন্য যা যা দরকার তার কিছুই আনিনি,—আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। আমি যখন কাল-যন্ত্র চালু করেছিলাম তখন আমার কেমন যেন একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল যে ভবিষ্যতের মানুষরা সবদিক থেকেই আমাদের থেকে উন্নত হবে। তাই আমি কিচ্ছু সঙ্গে নিইনি। না কোন অস্ত্রশস্ত্র, না কোন ওষুধপত্র, না ধূমপানের জন্য তামাক। তামাকের জন্যে মাঝে মাঝে আমার দারুণ কষ্ট হচ্ছিল। একটার বেশী দেশলাইও সঙ্গে আনিনি। ইস যদি একটা কোডাক ক্যামেরা নেওয়ার কথা ভাবতাম তাহলে এই মুহূর্তে ফ্ল্যাশ লাইটের সাহায্যে এই মাটির নিচের অন্ধকারের জীবদের ছবি তোলা যেত। তারপর অবসর সময়ে ভাল করে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারতাম। অতএব বাধ্য হয়ে প্রকৃতির দেওয়া অস্ত্র ও শক্তি নিয়ে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। দুখানা হাত, দুটো পা, দু'পাটি দাঁত আর কিছু দেশলাই-এর কাঠি কেবল আমার একমাত্র সম্বল।

'অন্ধকারে যন্ত্রপাতির মধ্যে ঢুকতে আমার সাহস হল না। অবশেষে এক সময় আবিষ্কার করলাম যে আমার দেশলাই-এর কাঠি কমে

এসেছে। এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত একবারো আমার মনে হয়নি যে দেশলাই-এর কাঠি আমাকে বুঝে-সুঝে খরচ করতে হবে। অর্ধেক কাঠি আমি নষ্ট করেছি 'ইলোই'দের অবাক করে দেওয়ার জন্য। কারণ 'ইলোই'দের কাছে আগুন একটা অভিনব জিনিস। এখন আমার কাছে মাত্র কয়েকটা কাঠি অবশিষ্ট। আমি যখন ওই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম তখন একটা হাত আমাকে স্পর্শ করল। লিকলিকে আঙুল আমার মুখের উপর ঘুরতে লাগল। একটা বিশ্রী গন্ধ আমার নাকে আসছিল। স্পষ্ট মনে হচ্ছিল আমার চারপাশে ওই কিম্ভুত প্রাণীদের একটা ভিড় জমে উঠেছে। ওদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার হাত থেকে কেউ দেশলাইটা টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কেউ আমার জামাকাপড় ধরে টানছে। এই বিদঘুটে জীবগুলো আমাকে পরীক্ষা করছে, একথাটা বুঝতে পারা মাত্র আমার সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। ওদের চিন্তা ভাবনা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই, এই কথাটা মনে হওয়া মাত্র আমি ভীষণ ভয় পেলাম। যত জোরে সম্ভব চিৎকার করে উঠলাম। ওরা একটু সরে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে ওরা আবার আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এবার ওরা আমাকে জোরে জাপটে ধরল। ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলাবলি করতে লাগল। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আবার চিৎকার করে উঠলাম। এবার ওরা ভয় পেল না বরং অদ্ভুত শব্দ করে হাসতে লাগল। আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার মত অবস্থা হল। আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম আর একটা দেশলাই-এর কাঠি আমাকে জ্বালাতেই হবে। আর এই আলোর সাহায্যে ওদেরকে ঠেকিয়ে রেখে আমাকে এই নরক থেকে পালাতে হবে। আমি দেশলাই-এর কাঠি জ্বাললাম, পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কাগজটা জ্বালিয়ে নিলাম। তারপর দ্রুত সেই সরু সুড়ঙ্গের

মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সুড়ঙ্গটা অতিক্রম করার আগেই কাগজটা নিভে গেল। 'মরলোক'রা ঝড়ের মত আমার দিকে ছুটে এলো।

মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো হাত আমাকে ধরে ফেলল। ওরা যে আমাকে টেনে ভিতরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। আমি আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে ওদের মুখের সামনে নাড়াতে লাগলাম। ওদের কী বীভৎস দেখতে তা বোধহয় আপনারা কোন দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। ফ্যাকাশে চিবুকহীন মুখ, পাতাহীন বড় বড় ধূসর-রক্তিম চোখ! কিন্তু ওদের ভালভাবে লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না। আমি আবার ছুটতে শুরু করলাম। কাঠিটা নিভে যাওয়ার পর আর একটা কাঠি জ্বালালাম। কূঁয়োর মুখে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে এ কাঠিটাও নিভে গেল। আমি ঝুঁকে লোহার হুকটা ধরে ফেললাম, কিন্তু সুড়ঙ্গ থেকে পা টেনে নেওয়ার আগেই কে যেন আমার একটা পা চেপে ধরল। তারপর হ্যাঁচকা একটা টান দিল ভিতরের দিকে। আমি শেষ কাঠিটা জ্বালালাম···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওটা নিভে গেল। আমি শক্ত করে লোহার হুক আঁকড়ে ধরলাম। তারপর লাথি চালাতে লাগলাম। অতি কষ্টে আমি 'মরলোক'দের হাত থেকে মুক্তি পেলাম। খুব তাড়াতাড়ি আমি উপরে উঠতে লাগলাম। ওরা ড্যাবডেবে চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

'মনে হচ্ছিল আমি আর কোনদিন আলোর মুখ দেখতে পাব না। কুয়োর মুখ থেকে যখন প্রায় বিশ ফুট কি ত্রিশ ফুট নিচে ছিলাম তখন হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল। মনে হল আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারব না। হাত ফসকে অন্ধকারের অতলে পড়ে যাব। শেষের দিকে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলার মত অবস্থা হল। মাথা ঘুরতে লাগল। মনে হল আমি পড়ে যাচ্ছি। শেষ পর্যন্ত কিভাবে যে উঠে এসেছিলাম তা মনে করতে পারছি না। অন্ধকারের জগত থেকে আবার আলোর

জগতে ফিরে আসতে পেরে মনে মনে ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। তারপরই মুখ থুবড়ে পড়লাম। মাটির গন্ধ বড় মধুর মনে হল। তারপরই মনে হল উইনা আমার হাত ও কানে চুমু খাচ্ছে। অন্যান্য 'ইলোই'দের কণ্ঠস্বর আমার কানে ভেসে এল। তারপর আর কিছু মনে নেই।'

সাত

'জ্ঞান হতেই মনে হল আগের থেকে আরো খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছি। কাল-যন্ত্রটা চুরি যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যেকোন সময় এখান থেকে নিজের জগতে ফিরে যেতে পারব। কাল-যন্ত্রটা হারিয়ে যাওয়ার পরও আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল ওটা ফেরৎ পাবো ও পালিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সে আশা নিতান্ত দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। 'ইলোই'দের দুর্বলতা ও সরলতা আমার মনে এক ধরণের সাহস যোগাচ্ছিল। ভাবছিলাম এরা যদি আমার কাল-যন্ত্রটা লুকিয়ে রেখে থাকে তাহলে যে করেই হোক ওটা আমি উদ্ধার করতে পারবই। তারপর এখান থেকে পালানো খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে না। কিন্তু ওই 'মরলোক'দের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা উপেক্ষা করা সহজ নয়। ওদের আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম। গর্তে পড়ে গেলে মানুষ প্রথমে গর্ত থেকে ওঠার চেষ্টা করে। আমিও তখন ভাবছিলাম কুয়ো থেকে বেরুতে পারলেই বুঝি আমার মুক্তি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার অবস্থা ফাঁদে পড়া জন্তুর মত। আমাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর জন্য।

'সে মৃত্যুর স্বরূপ হচ্ছে অমাবস্যার অন্ধকারের মত। উইনা

আমার মাথায় প্রথম ঢোকায় এই কাল-রাত্রির কথা। এখন আর আমার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কাল-রাত্রির প্রকৃত অর্থ কি? চাঁদ ক্ষয়ে আসছে। প্রত্যেক রাত্রে অন্ধকার বাড়ছে। অন্ধকার রাতে 'মরলোক'রা কি করবে তার একটা অস্পষ্ট আভাষ যেন পাচ্ছিলাম; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পুরো ব্যাপারটা মনে মনে চিন্তা করতেও আমার সারা শরীর ভয়ে আতঙ্কে হিম হয়ে আসছিল। আমার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যে ভুল সে বিষয়ে আমি এখন নিঃসন্দেহ। একদিন উপরের বাসিন্দারা হয়ত প্রভু ছিল আর 'মরলোক'রা ছিল ওদের আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু সেদিন বদলে গেছে বহুদিন আগেই। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতের মানুষ সম্পূর্ণ দুটো আলাদা জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের সম্পর্কও বদলে গেছে সংঘাতিক ভাবে। 'ইলোই'রা পুরোনো রাজবংশের মত লোপ পেতে বসেছে। তারা এখন শুধু অসার সৌন্দর্যের প্রতীক। অবশ্য তারা এখনো ভূ-পৃষ্ঠের দখলটা বজায় রেখেছে। 'মরলোক'রা বংশানুক্রমে মাটির তলায় থাকতে থাকতে বাইরের আলোর জগতে বাস করার অনুপোযুক্ত হয়ে উঠেছে। এই 'মরলোক'রাই 'ইলোই'দের জামাকাপড় তৈরী করে দেয় বলে আমার ধারণা হল। শুধু জামাকাপড় নয় ওদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই 'মরলোক'রা সরবরাহ করে থাকে। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। মনে হয় ওদের পুরোনো অভ্যাসটা এখনো কোন রকমে টিকে রয়েছে। অথবা এও হতে পারে—যে মানুষ যেমন জীবজন্তু শিকার করে আনন্দ পায়, তেমনি 'মরলোক'রাও 'ইলোই'দের জন্য জামাকাপড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র সরবরাহ করে তেমনি আনন্দ পায়। উপমাটা বড় কষ্টকল্পিত কিন্তু এছাড়া অন্য ব্যাখ্যা আমার মাথায় আসছিল না। তবে একথা স্পষ্ট যে পুরোনো ব্যবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে। বহুকাল, বহু পুরুষ আগে মানুষ তার আপনজনকে সুখ সাচ্ছন্দ থেকে উৎখাত করেছিল। তাদেরকে অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। এখন সেই অন্ধকারের জীবরা উঠে আসছে প্রতিশোধ নিতে। 'ইলোই'রা আবার একটা পুরোনো

শিক্ষা নতুন করে পাচ্ছে। তারা নতুন করে ভয়ের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। মাটির নিচে যে মাংস দেখেছিলাম তার স্মৃতি হঠাৎ ভেসে উঠল আমার মনে। জানি না কেন ওকথাটা আমার মনে পড়ল। মাংসটা কিসের তা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম, কিন্তু অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেও তা প্রকাশ করতে আমি অক্ষম।

'যদিও এই দুর্বল 'ইলোই'রা রহস্যময় আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে উঠছিল, তবু আমার ব্যাপারটা একটু অন্য রকম ছিল। আমি অন্য জগৎ থেকে এখানে এসেছি। যেখানে ভয় আমাদের পঙ্গু করতে পারেনি আর রহস্য হারিয়েছে তার ভয়াবহতা। আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করলাম যে খুব দ্রুত কোন অস্ত্র তৈরী করে নিতে হবে, আর একটা নিরাপদ বিশ্রামের জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। কি সাংঘাতিক জীবদের মুখের সামনে আমি খোলা জায়গায় রাত কাটিয়েছি তা ভাবতেই আমার আগেকার সাহস অনেক পরিমাণে কমে গেল। সুতরাং এখন এই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে রাত কাটানো আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি একটা নিরাপদ আশ্রয় জোগাড় করতে না পারি, তাহলে আমাকে বিনিদ্র রাত কাটাতে হবে। ওরা আমাকে কিভাবে পরীক্ষা করেছিল সেকথা মনে পড়তে ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম।

'টেমস নদীর উপত্যকায় সারা বিকেলটা ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু মনের মত কোন নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেলাম না। সমস্ত প্রাসাদ ও গাছপালাগুলোর 'মরলোক'রা উঠতে পারবে। ওদের কূয়োয় ওঠানামা করা দেখেই তা আমি বুঝতে পারছি। হঠাৎ আমার সেই সবুজ চানেমাটির প্রাসাদের গম্বুজগুলোর কথা মান পড়ল। মনে পড়ল ওর মসৃণ দেওয়ালের কথা। সন্ধ্যাবেলা উইনাকে একটা বাচ্চা মেয়ের মত কাঁধে চাপিয়ে আমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। আগে ভেবেছিলাম ওই সবুজ প্রাসাদের দূরত্ব সাত আট মাইলের বেশী হবে না। কিন্তু আসল দূরত্ব বোধহয় আঠারো মাইল।

প্রথম যেদিন প্রাসাদটাকে দেখেছিলাম সেদিন বিকেলবেলা বাতাসে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প ছিল। এরকম অবস্থায় দূরের জিনিসকে বেশ কাছে মনে হয়। তার উপরে আমার জুতোর একটা গোড়ালী খুলে গিয়ে একটা পেরেক উঠে পায়ে ফুটছিল। জুতো জোড়াটা খুব পুরোনো ছিল,—আমি বাড়িতে ওটা ব্যবহার করতাম। অতএব খোঁড়াতে লাগলাম। আমি যখন প্রাসাদটাকে দেখতে পেলাম তার অনেক আগে সূর্য ডুবে গেছে। হাল্কা হলুদ রঙের আকাশের গায়ে প্রাসাদটা যেন একটা কালো ছায়ার মত লেপটে ছিল।

'উইনাকে কাঁধে করে যখন হাঁটতে শুরু করেছিলাম তখন ও খুব মজা পাচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ও কাঁধ থেকে ওকে নামিয়ে দিতে বলল। তারপর ও আমার পাশে পাশে প্রায় ছুটতে লাগল আর রাস্তার দুধারের ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার পকেট বোঝাই করতে লাগল। আমার পকেটগুলো ওর কাছে সবসময় খুব রহস্যময় জিনিস ছিল। ওর মনে হয়েছিল পকেটগুলো ফুল রাখার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা। জামা পাল্টাতে গিয়ে আবার আমার উইনার কথা মনে পড়ল,—আর এগুলো পেলাম।'

বলে সময়-পর্যটক একটু থামলেন, তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিঃশব্দে দুটো শুকনো ফুল বের করে টেবিলে রাখলেন। ফুলগুলো অনেকটা বড় সাদা মেলোজ ফুলের মত দেখতে। তারপর আবার তিনি তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

'সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল। আমরা পাহাড়ে উঠছিলাম। কিন্তু উইনা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল, আর সেই ধূসর রঙের পাথরের প্রাসাদে যেখানে ওরা রাতে ঘুমোয় সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু আমি ওকে দূরের সবুজ চিনেমাটির প্রাসাদের উঁচু চূড়া দেখালাম এবং বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমরা ওখানে আশ্রয় নেব, তাহলে আর কোন ভয় থাকবে না। রাত্রি নামার ঠিক আগে একটু সময়ের জন্য সব কিছু যেন হঠাৎ থেমে যায়। এমনকি গাছের পাতারাও

স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়টা আমার কাছে এক অদ্ভুত অনুভূতি বহন করে আনে। আকাশ পরিষ্কার। দূরের সব কিছু তখনো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিনের সেই বিশেষ মুহূর্তে আমার অনুভূতির পরিবর্তন ঘটল। আমি ভয় পেলাম। সেই আগত-রাত্রির অন্ধকারে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন সজাগ হয়ে উঠল। এমনকি আমার পায়ের নিচের ফাঁপা সুড়ঙ্গ গুলোকেও যেন আমি অনুভব করতে পারলাম পাহাড়ের উপর থেকেই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম 'মরলোক'রা সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। ওরা হয়ত ভাল করে অন্ধকার হবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমার মনে হচ্ছিল ওদের জগতে অনধিকার প্রবেশের জন্য ওরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ওরা আমার কাল-যন্ত্রটা কি এই জন্যে চুরি করেছে ?

'আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম। গোধূলী আস্তে আস্তে রাত্রে পরিবর্তিত হল। দূরের নীলাভা আস্তে আস্তে মুছে গেল। তারপর আকাশে একটি একটি করে তারা ফুটতে আরম্ভ করল। চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল। গাছপালা গুলো কালো হয়ে উঠল। উইনার ক্লান্তি ও ভয় বাড়তে লাগল। আমি একহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম, যাতে ওর ভয় কেটে যায়। অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠল। উইনা আমার কাঁধে হাত রাখল। তারপর চোখ বন্ধ করে আমার কাঁধে মুখ ঘসতে লাগল। আমরা বেশ খানিক উৎরাই পার হয়ে একটা ছোট্ট উপত্যকায় এসে পৌঁছুলাম। সেই অন্ধকারে আমি একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হয়ে গেলাম। তারপর একসময় উপত্যকার অন্য পাড়ে গিয়ে পৌঁছুলাম। কতকগুলো পোড়ো বাড়ি পেরিয়ে একটা মুণ্ডু ভাঙা স্ট্যাচু দেখতে পেলাম। বুনো বাবলার ঝোপ এদিক ওদিকে। এখনো পর্যন্ত 'মরলোক'দের দেখা পাই নি। তবে এখনো যথেষ্ট সময় আছে, এই তো সবে রাত্রি শুরু হল।

'পরের পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম সামনে গভীর জঙ্গল রয়েছে। আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম। জঙ্গলের শেষ কোথায় তা

বুঝতে পারছিলাম না। ডাইনে বাঁয়ে কোনদিকেই ভাল করে নজর চলছিল না। পা দুটো টনটন করছিল। আর এগুতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। বাধ্য হয়ে সাবধানে উইনার মাথাটা আমার কাঁধ থেকে নামিয়ে ওকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওর পাশে বসে পড়লাম। সবুজ চিনেমাটির প্রাসাদটা আর দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ মনে হল ঠিক রাস্তায় এসেছি তো? আমি আবার জঙ্গলের দিকে তাকালাম আর ভাবতে লাগলাম ওর ভিতরে কি থাকতে পারে? ওই গভীর জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা তারার মুখও দেখা যাবে না। আর কোন বিপদ না থাকলেও —একটা বিপদ, যা আমি ভাবতেও চাইছি না—তা নিশ্চয় ওই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ওৎ পেতে রয়েছে।

'আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সারাদিনের পরিশ্রম ও উত্তেজনা তার জন্য দায়ী। তাই ঠিক করলাম এখন আর জঙ্গলে ঢুকব না। বরং এই উন্মুক্ত পাহাড়ের উপর রাতটা কাটিয়ে দেব।

'দেখলাম উইনা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি খুশী হলাম। আমার জ্যাকেটটা দিয়ে ওর শরীর ঢেকে দিলাম। তারপর ওর পাশে বসে চাঁদ উঠবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। চারপাশ শান্ত ও নির্জন। কিন্তু জঙ্গলের দিক থেকে মাঝে মাঝে জন্তু-জানোয়ারের চলাফেরার আওয়াজ ভেসে আসছিল। রাতের আকাশ পরিষ্কার থাকায় আমি মাথার উপর তারার দলকে দেখতে পাচ্ছিলাম। ওরা মিটমিট করে জ্বলছিল। মনে হচ্ছিল এই অন্ধকার রাতে ওরাই আমার একমাত্র বন্ধু। আকাশের পুরোনো তারা-মণ্ডলীর যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। ওই তারা-মণ্ডলী এত ধীরে স্থান পরিবর্তন করে যে মানুষ একশ জন্ম লক্ষ্য করলেও তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সেই তারা-মণ্ডলীরা এই বিরাট সময়ের ব্যবধানে নিজেদের নতুন ভাবে সাজিয়ে নিয়েছে। এই নতুন তারা-মণ্ডলী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু ছায়াপথের কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে আমার মনে হল না। সেই আকাশ গঙ্গা যেমন ছিল হয়ত তেমনি আছে। দক্ষিণ দিকে (অবশ্য আমার হিসেব মত) একটা বড়

লাল তারা দেখা যাচ্ছিল। তারাটা আমার কাছে নতুন। আমাদের সবুজ সিরিয়াস থেকেও এটাকে সুন্দর মনে হচ্ছিল। এই অসংখ্য আলোর বিন্দুর মধ্যে একটা উজ্জ্বল গ্রহ শান্তভাবে জ্বলজ্বল করছিল পুরোনো কোন বন্ধুর মুখের মত।

এই নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে আমার নিজের আতঙ্কের কথা ভাবতে কেমন যেন লজ্জা করল। শুধু আমার দুঃখের কথা নয়, সমস্ত পার্থিব দুঃখের ব্যাপারটাই যেন এই পরিপ্রেক্ষিতে তুচ্ছ বলে মনে হল। আমি ভাবতে লাগলাম কী অসীম দূরত্বে ওরা রয়েছে। ভাবতে লাগলাম ওদের ধীর কিন্তু নিয়মিত গতির কথা, যার সাহায্যে ওরা অজানা অতীত থেকে অজানা ভবিষ্যতে পাড়ি জমাচ্ছে। আমি প্রিসিসান অব দা ইকুইনক্স চক্রের কথা ভাবছিলাম। মাত্র চল্লিশবার নিঃশব্দে ঘুরলেই আমি যতকাল পাড়ি দিয়েছি তা কেটে যাবে। আর মাত্র এই কয়টি ঘূর্ণনের ফলে মানুষের সমস্ত সভ্যতা, সমস্ত কৃষ্টি, জটিল সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা, সাহিত্য, আশা-আকাঙ্খা, এমন কি আমরা যে মানুষ জাতিকে জানি তার স্মৃতি পর্যন্ত ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তার বদলে থাকবে এইসব বিদঘুটে জীব, যারা তাদের পূর্বপুরুষদের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। এই প্রচণ্ড ভয়ের কথাও ভাবতে লাগলাম, বর্তমানে একই মানুষ জাতির দুই শাখার মধ্যে যা বিরাজমান। হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। মাটির নিচে কিসের মাংস দেখেছিলাম তা যেন এখন স্পষ্ট হয়ে উঠল। উঃ কী ভয়ঙ্কর! আমি উইনার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকালাম। আকাশের লক্ষ কোটি তারার নিচে ওর ঘুমন্ত মুখখানাও আমার কাছে ওই তারাদের মতই সুন্দর বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে ওই বীভৎস চিন্তাটা আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম।

'সেই দীর্ঘ রাত্রি কাটাবার সময় 'মরলোক'দের চিন্তা করব না ঠিক করলাম তারচেয়ে আকাশের নতুন নক্ষত্রপুঞ্জ দেখে সময় কাটাব। দু এক টুকরো মেঘ ছাড়া আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। মাঝে মাঝে ঝিমুনি আসছিল। অবশেষে পুব আকাশে সামান্য আলোর আভাষ দেখা

দিল, রঙহীন আগুনের প্রতিবিম্বের মত। তারপর পাতলা ক্ষীণ চাঁদ উঠল। একটু পরে পাণ্ডুর চাঁদকে অতিক্রম করে উষার আগমন ঘটল। আস্তে আস্তে সমস্ত পটভূমি ও আকাশ গোলাপী আভা ধারণ করল। সারারাতের মধ্যে কোন 'মরলোক' আমাদের ধারে কাছে আসেনি। পাহাড়ের এদিক ওদিকেও ওদের কোন সাড়াশব্দ পাইনি। দিনের আলোয় আবার আমার মনে সাহস ফিরে এলো। মনে হল এত ভয় পাওয়াটা অযৌক্তিক। আমি উঠে দাঁড়ালাম। গোড়ালী ফুলে গেছে, হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা। বাধ্য হয়ে আবার বসে পড়লাম। জুতোজুটো খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

'উইনাকে ডাকলাম। তারপর আমরা জঙ্গলের দিকে রওনা দিলাম। রাতের সেই অন্ধকারে, ভয়াবহ জঙ্গল এখন সবুজ ও সুন্দর হয়ে দেখা দিল। কিছু ফলমূল জোগাড় করে খিদে মেটালাম। আবার সেই মাংসের কথা আমার মনে পড়ল। এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওটা কিসের মাংস। বহু, বহু কাল আগে যখন ভবিষ্যৎ মানুষের সভ্যতায় ভাঙন ধরে ছিল তখন 'মরলোক'দের খাবারে টান পড়েছিল। প্রথম দিকে হয়ত তারা ইঁদুরটিঁদুর খেয়ে বেঁচে থাকতো। মানুষের মাংস না খাওয়ার সংস্কার কিন্তু খুব গভীরভাবে মানুষের মনে কখনই বাসা বাঁধে নি। তাই মানুষের এইসব অমানবিক সন্তানরা............! আমি ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলাম। তিন চার বছর আগেকার আমাদের নর-মাংসাসী পূর্বপুরুষদের থেকে 'মরলোক'দের অনেক তফাৎ। যে সভ্যতা এদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। দূর এসব নিয়ে ভেবে আমার কি লাভ? এই 'ইলোই'রা চর্বিজমা ভেড়া বা ছাগলের পালের মত। যাদের 'মরলোক'রা বাঁচিয়ে রাখে নিজেদের খাবার জন্য। হায়! উইনা এখন আমার পাশে নাচছে। নিজের মানসিক আতঙ্ককে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। মানুষ অন্যের শ্রমের বিনিময়ে সুখে স্বচ্ছন্দে চিরকাল বাস করে এসেছে। বুদ্ধিবৃত্তির যতই অবক্ষয় হয়ে থাক, এই 'ইলোই'রা এখনো মানুষের

চেহারা নিয়ে টিকে আছে।

'আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি আমার করণীয়। আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করা ও পাথর বা ধাতু দিয়ে এমন অস্ত্রশস্ত্র বানানো যাতে আমি আত্মরক্ষা করতে পারি। এটা অত্যন্ত জরুরী। তারপর দরকার একটু আগুনের তাহলে মশালের মত একটা অস্ত্র তৈরী করে ফেলতে পারব। আর মরলোক'দের বিরুদ্ধে মশালই হচ্ছে সবথেকে শক্তিশালী অস্ত্র। তারপর ওই সাদা স্ফিঙ্কসের পিতলের দরজা ভাঙার মত একটা ভারি জিনিস আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার মন বলছিল আমি যদি ওই পিতলের দরজা ভেঙে একটা মশাল হাতে ভিতরে ঢুকতে পারি তাহলে নিশ্চয় আমার কাল-যন্ত্রটাকে দেখতে পাব। আমার ধারণা হচ্ছিল 'মরলোক'রা এত শক্তি-শালী নয় যে যন্ত্রটাকে অনেকদূর টেনে নিয়ে যেতে পারবে। উইনাকে সঙ্গে নিয়ে আসব বলে ঠিক করে ফেলেছিলাম। এইসব কথা চিন্তা করতে করতে আবার সেই সবুজ প্রাসাদের দিকে এগুতে শুরু করলাম।

আট

'প্রায় দুপুর নাগাদ সেই সবুজ চিনেমাটির প্রাসাদটা চোখে পড়ল। জনমানব হীন একটা ধ্বংসস্তূপের মত। জানালার কাচগুলো ভাঙা। বড় বড় সবুজ চিনেমাটির চাঙড় ভেঙে পড়ে আছে সামনের দিকে।

প্রাসাদটা ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলাম ওটা চিনেমাটিরই তৈরী। সামনের দেওয়ালে অজানা ভাষায় কি সব লেখা। আমি বোকার মত ভাবলাম উইনা হয়ত এই লেখার পাঠোদ্ধারের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম

যে লেখাপড়ার ব্যাপারে ও কিছু জানে না। আমি ওকে মানুষের থেকেও বেশী ভাবতাম তার কারণ হয়ত ওর ভালবাসা মানুষেরই মত।

'বড় বড় ভাঙা দরজা পেরিয়ে ভিতরে একটা বড় হলঘর দেখব আশা করেছিলাম ; কিন্তু তার বদলে দেখতে পেলাম লম্বা বারান্দা। বারান্দার পাশে অনেকগুলো জানলা। হঠাৎ দেখলে কোন যাদুঘরটর বলে মনে হবে। মোজাইক করা মেঝেয় ধুলো জমেছে পুরু হয়ে। আর বিভিন্ন জিনিস পত্র ছড়ানো রয়েছে চারিদিকে। তারপরই আমি একটা কঙ্কাল দেখতে পেলাম। মেগাথেরিয়ামের মত কোন জন্তুর নিচের দিকটা বলেই আমার মনে হল। মাথা ও উপরের দিকটা ভেঙে ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে। ভাঙা ছাদ থেকে একটা জায়গায় জল চুঁইয়ে পড়ে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। ব্রণ্টোসরাসের একটা বিরাট কঙ্কালও রয়েছে এই বারান্দায়। যাদুঘর বলে যে ধারণা হয়েছিল দেখলাম তা সঠিক। বারান্দার ধারে যেতেই দেখতে পেলাম অনেক তাক রয়েছে। ধুলো সরাতেই বহু কাচের জার দেখতে পেলাম, আমাদের যাদুঘরে যেমন থাকে। জারগুলো নিশ্চয় এককালে বাতাস নিরোধক ছিল।

'আমরা একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল এখানে প্যালেণ্টোলজিক্যাল সেকসান ছিল। চারিদিকে প্রচুর জীবাশ্ম ছড়ানো যদিও সময়ের ব্যবধানে সবই প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে ওখানে এইসব 'ইলোই'দের জীবাশ্মও দেখতে পেলাম। কিছু ভেঙে গেছে। কিছু আবার তার দিয়ে বাঁধা রয়েছে। কিছু কিছু জার সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আমার মনে হল 'মরলোক'রা এগুলো করেছে। জায়গাটা নিস্তব্ধ। মেঝের পুরু ধুলোর স্তর আমাদের পায়ের শব্দকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। উইনা এতক্ষণ একটা সমুদ্র কাঁকড়ার জীবাশ্ম নিয়ে টানাটানি করছিল, এবার ও এসে আমার হাত ধরে আমার পাশে দাঁড়াল।

'এই প্রাচীন সভ্যতার যাদুঘর দেখে আমি এমনই হতবাক হয়ে গিয়ে

ছিলাম যে কোন বিপদ আপদের কথা আমার মনেই আসেনি। এমনকি কাল-যন্ত্রের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম।

'এই সবুজ চিনেমাঠির প্রাসাদে প্যালেন্টোলজিক্যাল বিভাগ ছাড়াও নিশ্চয় ঐতিহাসিক বিভাগ ও পাঠাগার আছে বলে মনে হল আমার। যাদুঘরটা আমার কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল। ঘুরতে ঘুরতে আর একটা ছোট বারান্দা দেখতে পেলাম। এখানে সব খনিজপদার্থ রয়েছে বলে মনে হল। এক ড্যালা গন্ধক দেখে আমার বারুদের কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু কোথাও সোরা খুঁজে পেলাম না। ওগুলো হয়ত বহুকাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু গন্ধকের কথা ভুলতে পারলাম না। যদিও এখানে আরো বহু মূল্যবান খনিজদ্রব্য ছিল কিন্তু সেগুলো সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহলই দেখা দিল না। অবশ্য আমি খনিজদ্রব্য বিশেষজ্ঞ নই। এখান থেকে বেরিয়ে আর একটা বারান্দায় ঢুকলাম। এটা আগের বারান্দাটার সঙ্গে সমান্তরালে অবস্থিত। মনে হল এই বিভাগটা ন্যাচারাল হিস্ট্রীর। সব কিছু বহুকাল আগেই নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু ভাঙাচোরা জীবজন্তুর কঙ্কাল, মামি, ছাড়া আর কিছু চেনবার উপায় নেই। এর পর আমরা আর একটা বিরাট উঁচু গ্যালারীতে এলাম। এখানে আলোটালো তেমন ঢোকে না। মেঝেটা আবার ঢালু। ছাদ থেকে গোল গোল বল টাঙানো রয়েছে কিছু দূর অন্তর। তার মধ্যে বেশীর ভাগই ভেঙে গেছে বা কেটে গেছে। দেখে মনে হয় জায়গাটা কৃত্রিম ভাবে আলোকিত করার ব্যবস্থা ছিল। চারিদিকে সব বড় বড় বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র। বেশীর ভাগই মরচে পড়ে ভেঙে গেছে। কিন্তু কিছু কিছু এখনো সম্পূর্ণ আছে। আপনারা জানেন যন্ত্রপাতির প্রতি আমার কেমন যেন একটা অন্ধ আকর্ষণ আছে। আমি এই গ্যালারীটার মধ্যে একটু বেশী সময় কাটাবো বলে মনস্থির করলাম। এখানকার বেশীর ভাগ জিনিসই কেমন যেন ধাঁধা বলে মনে হচ্ছিল। যদি এই ধাঁধার উত্তর খুঁজে পাই তাহলে 'মরলোক'দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার মত শক্তি আমার হাতে এসে যাবে।

'হঠাৎ উইনা আমার খুব কাছে সরে এলো। আমি প্রায় চমকে উঠেছিলাম! উইনার জন্যই আমি বুঝতে পারলাম যে ঘরের মেঝেটা ঢালু। সবশেষে যেখানে এসে পৌঁছেছিলাম সে জায়গাটা মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে। কতকগুলো জানলা বসানো আছে জায়গাটায় আলো আসার জন্যে। উইনার আকস্মিক আবির্ভাবে আমি ব্যাপারটা খেয়াল করলাম। লক্ষ্য করলাম গ্যালারীটার শেষের দিকটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম, তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম জায়গাটা এবড়োখেবড়ো আর ধূলোর স্তর এখানে খুবই কম। সামনের অন্ধকারের দিকে ছোট ছোট সরু সরু পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এখানে নিশ্চয় 'মরলোক'রা আছে। মনে হল এইসব যন্ত্রপাতিগুলো দেখে অযথা সময় নষ্ট করছি। বিকেল হতে বেশী দেরী নেই। অথচ আমি এখনো কোন অস্ত্র জোগাড় করতে পারিনি, এখনো একটা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারিনি, আগুন জ্বালাবার কোন কিছুর ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। তখুনি সেই অন্ধকারের দিক থেকে বিচিত্র শব্দ ভেসে এলো। এ সেই শব্দ যা আমি কূয়োর মধ্যে শুনেছিলাম।

'আমি উইনার হাত শক্ত করে চেপে ধরলাম। তারপর হঠাৎ ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটা যন্ত্রের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা লম্বা লীভারে হাত রাখলাম। ওটাকে শক্ত করে ধরে দুপাশে নাড়াতে লাগলাম। উইনা হঠাৎ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। যন্ত্রগুলোর অবস্থা আমি ঠিকই ধারণা করেছিলাম। মিনিটখানেক লীভারটা ধরে টানাটানি করতেই ওটা খুলে আমার হাতে চলে এল। আমি ওটা হাতে নিয়ে ছুটে উইনার কাছে চলে গেলাম। হ্যাঁ এটার আঘাতে এবার আমি যে কোন 'মরলোকে'র মাথা ফাটিয়ে দিতে পারি। মনে হচ্ছিল একটা 'মরলোক' মারতে পারলে আমি দারুণ খুশী হতাম। নিজের বংশধরদের হত্যা করা খুবই অমানবিক ব্যাপার সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বংশধরদের মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিটে ফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না। শুধু উইনাকে একা ফেলে

রেখে যেতে হবে আর যদি হত্যালীলায় মেতে উঠি তাহলে আমার কাল-যন্ত্রটা উদ্ধার করা মুস্কিল হতে পারে এই দুটো কথা ভেবেই আমি ওই অন্ধকারের দিকে ছুটে গেলাম না।

'একহাতে লোহার ডাণ্ডা আর অন্য হাতে উইনাকে ধরে আমি এই গ্যালারী থেকে বেরিয়ে আর একটা গ্যালারীতে ঢুকলাম। এটা আরো বড়। দেওয়ালের পাশে বাদামী রঙের ছেঁড়া কাপড়ের মত কিছু ঝুলছিল। দেখেই মনে হল এগুলো এক সময় বই ছিল। পাতাগুলো ছিঁড়ে গেছে আর ছাপার কালি অদৃশ্য হয়েছে। সাহিত্যিক হলে বলতাম মানুষের আশা আকাঙ্খার কি করুণ পরিণতি!

'তারপর একটা বড় সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আর একটা গ্যালারীতে ঢুকলাম। গ্যালারীটা বোধবয় টেকনিক্যাল কেমিস্ট্রির বিভাগ ছিল। এখানে নতুন কিছু আবিস্কারের সম্ভাবনা বেশী বলেই আমার মনে হল। একপ্রান্তে ছাদ ভেঙে পড়ে যা ক্ষতি হয়েছে তাছাড়া এ গ্যালারীটা ভালই আছে। আমি প্রত্যেকটা তাক পরীক্ষা করলাম। অবশেষে একটা বাতাস নিরোধক পাত্রে একটা দেশলাইএর বাক্স দেখতে পেলাম। পাত্রটা খোলার চেষ্টা করলাম। দেশলাইটা খুব ভাল অবস্থায় আছে একেবারে শুকনো খটখটে। আমি উইনার দিকে ফিরে ওদের ভাষাতেই বললাম—'নাচো'। ওই বীভৎস প্রাণীগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার মত একটা মরণাস্ত্র অবশেষে খুঁজে পেয়েছি। সেই পোড়ো ও ধুলোভর্তি যাদুঘরের মেঝের উপর আমি আনন্দে নাচতে শুরু করলাম। উইনাতো মহাখুশী।

'আমি এখনো ভেবে অবাক হচ্ছি যে কি করে একটা দেশলাইএর বাক্স এতকাল টিকে রইল। অবশ্য আমার কাছে খুবই সৌভাগ্যের। এরপর একটা পাত্রে আবিষ্কার করলাম কর্পূর। এ পাত্রটাও বাতাস নিরোধক ছিল। প্রথমে জিনিসটাকে মোম মনে হয়েছিল। কাচটা ভেঙে ফেলতেই কর্পূরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আমি ডেলাটা ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তখুনি মনে হল কর্পূর জ্বালালে জ্বলে ও যথেষ্ট

আলো দেয়। অতএব ড্যালাটা পকেটে পুরলাম। কোন বিস্ফোরক খুঁজে পেলাম না। আর এমন কিছু খুঁজে পেলাম না য'র সাহায্যে পিতলের দরজাটা ভাঙতে পারি। এ পর্যন্ত লোহার ডাণ্ডাটা আমার খুব ক জ দিয়েছে। যাহোক এই গ্যালারী থেকে খুশী মনে বেরিয়ে পড়লাম।

'সারা বিকেল আরো বহু জায়গায় ঘুরলাম। একটা অস্ত্রশস্ত্রের গ্যালারীতে ঢুকেছিলাম। অনেক বন্দুক, পিস্তল ও রাইফেল সাজানো রয়েছে। বেশীর ভাগই মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। কিছু কিছু অবশ্য নতুন কোন ধাতুতে তৈরী। সেগুলো বেশ ভাল আছে। কিন্তু কোন টোটা বা বারুদ কোথাও নেই। সবই নষ্ট হয়ে গেছে। একটা কোণায় দেখলাম জিনিসপত্র সব ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। খুব সম্ভব কোন বিস্ফোরণের ফল। আর একটা গ্যালারীতে দেখলাম বিভিন্ন দেশের মূর্তি সাজানো রয়েছে, পলিনেশিয়ান, মেক্সিকান, গ্রেসিয়ান, ফোনেশিয়ান ইত্যাদি।

'সন্ধ্যা নেমে আসতেই আমার যাতুঘর দেখার আগ্রহ কমে এলো। গ্যালারীর পর গ্যালারী পার হতে লাগলাম, ধূলি-ধূসরিত, নিস্তব্ধ, জীর্ণ। কোন কোন জায়গায় দর্শনীয় বস্তু মরচে ও লিগনাইটে পরিবর্তিত হয়েছে। কোন কোন জায়গার অবস্থা একটু ভাল। এক জায়গায় হঠাৎ আমি একটা টিন-খনির মডেল দেখতে পেলাম। এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে একটা বাতাস-নিরোধক পাত্রে দুটো ডিনামাইটের টোটা আবিষ্কার করলাম। ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠে হাতের ডাণ্ডা দিয়ে কাঁচের পাত্রটা ভেঙে ফেললাম। একটু সন্দেহ হল। একটু ইতস্ততঃ করলাম। তারপর একটা ছোট সাইড গ্যালারী বেছে নিয়ে ছুঁড়লাম একটা টোটা। জীবনে এরকম অপ্রস্তুত কখনো হইনি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনের মিনিট অপেক্ষা করলাম বিস্ফোরণ ঘটার জন্য; কিন্তু কিছুই হল না। ও দুটো নকল ডিনামাইট আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। নকল খনির পাশে আসল

ডিনামাইট কি থাকে? কিন্তু যদি থাকত? তাহলে এক লাফে আমি সাদা স্ফিঙ্কসের কাছে পৌঁছে ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম।

'এরপর আমরা একটা ফাঁকা উঠোনে এসে পড়লাম। জায়গাটা ঘেরা ও সেখানে তিনটে ফলের গাছ ছিল। এখানে বসে আমরা বিশ্রাম নিলাম ও ফল পেড়ে খেলাম। সূর্য ডুববার সময় আমাদের অবস্থাটা আর একবার খতিয়ে দেখলাম। এখুনি রাত নামবে। নিরাপদে রাত কাটাবার জায়গা এখনো খুঁজে বের করা হয়নি। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর তেমন মাথা ঘামালাম না। এখন আমার কাছে এমন একটা জিনিস আছে যা 'মরলোক দের বিরুদ্ধে সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র। আমার কাছে একটা পুরো দেশলাই-এর বাক্স আছে। পকেটে আছে কর্পূরের ড্যালা। মনে মনে ঠিক করলাম আমরা উন্মুক্ত জায়গাতেই রাত কাটাবো, চারপাশে আগুন জ্বালিয়ে দেব। তারপর সকালবেলা কাল-যন্ত্রটা খুঁজে বের করতে হবে। অবশ্য এর জন্যে এই লোহার ডাণ্ডাটা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কাছে। কিন্তু এখন ওই পিতলের দরজা সম্বন্ধে আমি অন্যভাবে ভাবতে শুরু করলাম। আগে আমি দরজা ভাঙ্গার ব্যাপারে একটু ভয় পাচ্ছিলাম তার কারণ অন্যদিকের রহস্য সম্বন্ধে তখনো আমি অজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু এখন সে রহস্য আমি ভেদ করেছি। আর আমার হাতের লোহার ডাণ্ডাটা বেশ মজবুত।

নয়

'আমরা যখন প্রাসাদ থেকে বেরুলাম তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। পশ্চিম দিগন্তে লাল থালার মত তখনো সে ঝুলে রয়েছে। আমি ঠিক করলাম পরের দিন সকালেই সাদা স্ফিঙ্কসের কাছে পৌঁছুবো। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগেই আমি জঙ্গল পেরুবো, গতকাল যে জঙ্গল

আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। রাতের মধ্যে যতদূর সম্ভব চলে যেতে হবে। তারপর আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে রাত কাটাতে হবে।

পথ চলতে চলতে শুকনো ডাল বা ঘাস যা পাচ্ছিলাম তা সংগ্রহ করতে লাগলাম। একসময় আমার দুহাত ভর্তি হয়ে এল। আমরা যতটা এগিয়ে যাব বলে ঠিক করেছিলাম ততটা এগুনো সম্ভব হল না এইসব ডালপালা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাছাড়া উইনা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমারও ঘুম পাচ্ছিল। জঙ্গলে ঢোকার আগেই রাত গভীর হয়ে উঠল। উইনা হয়ত সামনে অন্ধকার জঙ্গল দেখে ভয় পেয়ে থেমে যেত। কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কা ও ভয়ে আমার মন এমনি আচ্ছন্ন হয়েছিল যে থামার কথা আমার মনেও এল না। দুদিন ও এক রাত্রি আমি বিনিদ্র কাটিয়েছি। এখন আমার জ্বর জ্বর লাগছে ও খুব অস্বস্তি হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল ঘুমে আমি ঢলে পড়ব আর সঙ্গে সঙ্গে 'মরলোক'রা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

'আমরা যখন ইতস্ততঃ করছি তখন আমাদের পিছনের কালো ঝোপের পাশে তিনটে চেহারাকে গুড়ি মেরে যেতে দেখলাম। আমাদের চারপাশে লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল। হিসেব করে দেখলাম জঙ্গল এখনো মাইলখানেকের মত রয়েছে। কোন রকমে যদি জঙ্গলটা পার হয়ে যেতে পারি তাহলে ওপারে খোলা পাহাড়ের উপরে আমরা অনেকখানি নিরাপদ হব। মনে মনে ভাবলাম যে দেশলাই ও কর্পূরের সাহায্যে অন্ধকার জঙ্গলের পথ আমি আলোকিত করতে পারব। কিন্তু এও মনে হল যে যদি আমি দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে এগুই তাহলে হাতের এই শুকনো ডালপালা ও ঘাসগুলো ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। অগত্যা ওগুলো মাটিতে ফেলে দিলাম। তারপর মনে হল এগুলো জ্বালিয়ে দিলে আমার পিছনের বন্ধুরা একটু ভয় পাবে। ডালপালা জ্বলিয়ে দেওয়ার বিপদের কথা তখন

একটুও আমার মাথায় আসেনি। আমি তখন শুধু ভাবছিলাম যে আমাদের পালাবার কথা চাপা দেওয়ার জন্য আগুন জ্বালাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

'আমি জানি না আপনারা জানেন কিনা,—উষ্ণ আবহাওয়ায় আগুনের শিখা যে কি জিনিস তা অভিজ্ঞতা না থাকলে অনুভব করা মুস্কিল। সূর্যের উত্তাপে কোন কিছু পোড়ে না শিশির বিন্দুর মাধ্যমে তির্যকভাবে পড়লেও তাতে বিশেষ কিছু হয় না। বাজ পড়লে কিছু জায়গা পুড়ে কালো হয়ে যায়; কিন্তু কখনো ব্যাপক আকারে আগুন ছড়ায় না। অনেক সময় দাবানল জ্বলে ওঠে; কিন্তু তারও শিখা থাকে না। এই জগতে আগুন জ্বালাবার কায়দা সবাই ভুলে গেছে। তাই শুকনো ডালপালায় আগুন জ্বেলে দেওয়ার পর লকলকে শিখা দেখে উইনা রীতিমত অবাক হয়ে গেল।'

'ও আগুনের মধ্যে লাফ দেওয়ার ও আগুন নিয়ে খেলা করতে চাইল। আমি ওকে বাধা না দিলে ও সত্যি সত্যি লাফ দিত। আমি ওকে ধরে ফেললাম। তারপর জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগলাম। পিছনের আগুনের শিখা বেশ কিছুটা পথ আলোকিত করে রাখছিল। পিছনে ফিরে দেখলাম আগুনটা আস্তে আস্তে পাশের ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটা আগুনের রেখা পাহাড়ের ঘাস পোড়াতে পোড়াতে উঠে আসছে। আমি একটু হেসে আবার সামনের অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকালাম। গভীর অন্ধকার। উইনা ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। চোখটাকে সইয়ে নিয়ে বুঝতে পারলাম যে এখনো যে ক্ষীণ আলো আসছে তাতে কিছুদূর পথ ভালভাবে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মাথার উপর গাঢ় অন্ধকার। শুধু মাঝে মধ্যে এক আধটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে নীল আকাশের অস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। আমি একটাও দেশলাই-এর কাঠি জ্বালতে পারলাম না কারণ আমার দুহাত জোড়া। একহাতে ধরে আছি আমার ছোট্ট বন্ধুকে আর অপর হাতে লোহার ডাণ্ডা।

'বেশ কিছুক্ষণ আমাদের পায়ের নিচে শুকনো পাতার শব্দ, মাথার উপরে হাল্কা হাওয়ায় পাতার দুলুনীর শব্দ, নিজেদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আর হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনী ছাড়া আর কিছু শুনতে পাইনি। তারপর আমার চারপাশে পাতার মড়মড়ানির শব্দ শুনতে পেলাম। আমি চমকে উঠলাম। মড়মড়ানির শব্দ বেড়ে উঠল, তারপর সেই বিচিত্র শব্দ শুনতে পেলাম যা শুনেছিলাম মাটির নিচের সুড়ঙ্গে। আমাদের চারপাশে মরলোক'। ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে অনুভব করলাম কেউ আমার কোট ধরে টানছে। তারপর আমার হাত ধরে কেউ টানল। উইনা ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠে নিশ্চল হয়ে পড়ল।

'এবার দেশলাই বের করতেই হবে। কিন্তু দেশলাই বের করতে হলে উইনাকে মাটিতে নামিয়ে দিতে হয়। তাই করলাম। আমি যখন পকেট হাতড়াচ্ছিলাম তখন অন্ধকারে আমার হাঁটুর কাছে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে গেল। উইনার কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। শুধু সেই মরলোক'দের বিচিত্র ফিসফিসানী আমার কানে এলো। নরম লিকলিকে হাত আমার কোটের উপর, আমার পিঠের উপর এমনকি আমার কাঁধ স্পর্শ করছিল। আমি দেশলাই বের করে জ্বালালাম। জ্বলন্ত কাঠিটা হাতে ধরে রইলাম। দেখলাম 'মরলোক'রা ছুটে পালাচ্ছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি কর্পুরের ড্যালাটা ভেঙে খানিকটা কর্পুর পকেট থেকে বের করে কাঠিটা নিভে যাওয়ার আগেই জ্বালাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। আমি উইনার দিকে তাকালাম। ও আমার পা জড়িয়ে ধরে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। ভয়ে আমি ওর দিকে ঝুঁকে পড়লাম। ওর নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। আমি কর্পুরের ড্যালাটায় আগুন ধরিয়ে মাটিতে নামিয়ে রাখলাম। দাউদাউ করে ড্যালাটা জ্বলে উঠল। 'মরলোক'রা আরো দূরে পালিয়ে গেল। আমি হাঁটু মুড়ে বসে উইনাকে তুলে ধরলাম। চারপাশের অন্ধকার জঙ্গল 'মরলোক'দের ফিসফিসানীতে ভরে উঠল।'

'উইনা অজ্ঞান হয়ে গেছে। আমি ওকে সাবধানে কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। এগুতে যাওয়ার আগে হঠাৎ এক ভয়াবহ অনুভূতি হল। দেশলাই জ্বালাতে ও উইনাকে তুলে ধরতে আমাকে বেশ কয়েক বার এদিক ওদিক করতে হয়েছে। কোনদিক দিয়ে এবার এগুতে হবে তার সামান্যতম আভাষটুকুও আমি বুঝতে পারছিলাম না। হয়ত আমি সবুজ চীনেমাটির প্রাসাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। ঘামতে শুরু করলাম। খুব তাড়াতাড়ি আমাকে ঠিক করতে হবে আমি এখন কি করব? ঠিক করলাম এখানেই আগুন জ্বালিয়ে বাকি রাতটুকু কাটাব। আমি আবার উইনাকে মাটিতে নামিয়ে দিলাম। ও তখনো নিশ্চল। কর্পূরের ড্যালাটা নিভে যাওয়ার আগে আমি খুব তাড়াতাড়ি কিছু শুকনো ডালপালা ও পাতা জড়ো করে ফেললাম। অন্ধকারের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে 'মরলোক'দের চোখগুলো দেখা দিচ্ছিল কার-বঙ্কল ঘায়ের মত।

'কর্পূরের ড্যালাটা হঠাৎ দপ করে নিভে গেল। আমি আবার একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালালাম। দুটো 'মরলোক' উইনার দিকে এগিয়ে আসছিল। কাঠি জ্বালতেই ওরা ছুটে পালাল। একটা তো আলো দেখে এমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যে সোজা আমার দিকে ছুটে এলো। আমি এক ঘুঁষিতে ওর বুকের পাঁজরা অনুভব করতে পারলাম। 'মরলোক'টা আর্তনাদ করে লাফ দিল, তারপর মুখ থুবড়ে গিয়ে পড়ল। আমি আর এক ড্যালা কর্পূর জ্বালালাম। তারপর আরো ডালপালা ও পাতা জোগাড় করতে লাগলাম। আমার মাথার উপরে অনেক শুকনো ডাল ঝুলছে। আমি এসেছি এখানে প্রায় সপ্তাখানেক। এর মধ্যে একদিনও বৃষ্টি হয়নি। সুতরাং ডালপালা বা পাতাগুলো শুকনো খটখটে। খুব শীঘ্রই আমি আগুন জ্বালিয়ে ফেললাম। তারপর আবার উইনার দিকে মনোযোগ দিলাম। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম কিন্তু উইনার জ্ঞান ফিরল না। আমার ভয় হচ্ছিল, উইনা সুস্থ হয়ে উঠবে তো?

'আগুনের ধোঁয়া আমার দিকে এগিয়ে আসছে। এখনো বাতাসে কর্পূরের গন্ধ রয়েছে। ঘণ্টাখানেকের জন্য নতুন ডালপালা বা ঘাস না দিলেও আগুন জ্বলবে। উত্তেজনা ও পরিশ্রমে বেশ কাতর হয়ে পড়েছিলাম। আমি বসে পড়লাম। জঙ্গলের মধ্যে থেকে নানারকম শব্দ ভেসে আসছে। একটু ঘুমের ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ মাথা ঝাঁকানি দিয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। চোখ খুলেই চমকে উঠলাম। চারিদিকে অন্ধকার। আর 'মরলোক'রা আমাকে ঘিরে ধরেছে। এক ঝটকায় ওদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে আমি পকেটে হাত ঢোকালাম দেশলাই-এর বাক্সটার জন্য—। না দেশলাই-এর বাক্স নেই। ওরা আবার আমাকে চেপে ধরল। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম কি ঘটেছে। আমি নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তার মধ্যে আগুন নিভে গিয়েছিল, আর এই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতেরা আমার উপর লাফিয়ে পড়েছিল। সারা জঙ্গলে পোড়া কাঠের গন্ধ। ওরা আমার কাঁধ, গলা, চুল, হাত সব চেপে ধরে মাটিতে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। রাতের অন্ধকারে ওই কুৎসিত জীবগুলো আমাকে বোধহয় শেষ করে ফেলবে। আতঙ্কে আমার গলা বুক শুকিয়ে উঠল। মনে হল যেন আমি এক বিরাট মাকড়সার জালে আটকা পড়েছি। আমি এখন সম্পূর্ণ অসহায়। কেউ যেন আমার কাঁধটা কামড়ে দিচ্ছে। আমি ওদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। আর তক্ষুণি আমি মাটিতে হাত দিয়ে লোহার ডাণ্ডাটা পেয়ে গেলাম। আবার আমার সাহস ফিরে এলো। আমি এই মানুষ-ইঁদুরগুলোকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। তারপর এলোপাথাড়ি ডাণ্ডা ঘোরাতে লাগলাম। প্রতি আঘাতে আমার ডাণ্ডা রক্ত ও কাঁচা মাংসের স্বাদ অনুভব করছিল। মুহূর্তের জন্য আমি নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।

'এত পরিশ্রম সহ্য করার মত শরীরের অবস্থা ছিল না। আমি

হাঁফাচ্ছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম এবার আমি ও উইনা দুজনে শেষ হয়ে যাব। কিন্তু মরার আগে কিছু 'মরলোক'কে অন্তত শেষ করে যাব। আমি একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাতের ডাণ্ডা ঘোরাতে লাগলাম। সারা জঙ্গলে 'মরলোক'দের আর্ত চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। এক মিনিট কেটে গেল। তারপর ওদের চিৎকার আরো বেড়ে উঠল। ওরা খুব দ্রুত ছোটাছুটি করতে লাগল। কিন্তু কেউ আমার ধারে কাছে এলো না। আমি অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। 'মরলোক'রা তাহলে বোধহয় ভয় পেয়েছে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে লাগল। খুব অস্পষ্টভাবে আমার চারপাশে 'মরলোক'দের ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। তিনটে আমার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর বুঝতে পারলাম ওরা দলে দলে পালাচ্ছে। ওদের পিঠগুলো এখন আর সাদা দেখাচ্ছে না মনে হচ্ছে লালচে। আমি মুখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম গাছের ডালে ডালে লাল শিখা লাফাচ্ছে। বুঝতে পারলাম কেন সারা জঙ্গল পোড়া কাঠের গন্ধে ভরে গেছে। ডালপালা পোড়ার শব্দ বাড়তে লাগল। লাল অগ্নিশিখা আর 'মরলোক'রা যেন পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল।

'গাছের কাছ থেকে একটু সরে এসে পিছনে তাকাতেই সামনের বড় বড় গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম অরণ্য জ্বলছে। আমার জ্বালানো আগুন আমাকেই গ্রাস করতে ছুটে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি উইনার দিকে তাকালাম। কিন্তু ওকে দেখতে পেলাম না। আগুনে ডালপালা ফাটার শব্দ আর চলন্ত আগুনের হিসহিসানি দ্রুত এগিয়ে আসছে। হাতে সময় খুবই কম। লোহার ডাণ্ডাটা শক্ত করে ধরে 'মরলোক'রা যেদিকে ছুটে পালিয়েছে আমি সেইদিকে ছুটতে শুরু করলাম। রীতিমত এক দৌড় প্রতিযোগিতা। আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল যে একবার তা হুস করে আমার

ডানপাশে এগিয়ে এলো। বাধ্য হয়ে আ মি বাঁদিকে ছুটতে লাগলাম। অবশেষে জঙ্গলের মধ্যে একটু ছোট্ট ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা 'মরলোক' সোজা আমার দিকে ছুটে এলো। তারপর আমাকে পাশ কাটিয়ে সোজা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল।'

ভবিষ্যৎ জগতে যতকিছু দেখেছি যার মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্কর জিনিস দেখার জন্যে আমি তৈরী হলাম। চারপাশের আগুনের জন্যে জায়গাটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে একটা ছোট্ট টিলা রয়েছে। টিলার পিছন দিকের জঙ্গলও পুড়ছে। লক লক করে লাফিয়ে উঠছে হলুদ শিখা। ফাঁকা জায়গাটুকু এখন আগুনের বেড়াজালে বন্দী। দূরে তিরিশ কি চল্লিশটা 'মরলোক' আগুনের শিখা ও তাপের চোটে প্রায় অন্ধের মত ছুটোছুটি করে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছে। প্রথমে আমি ওদের অবস্থা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলাম। ওরা আমার দিকে ছুটে আসতেই একটাকে খতম করে ফেলেছিলাম আর অন্যগুলো মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন দেখলাম ওরা অন্ধের মত আমার দিকে ছুটে আসছে তখন আমি ওদের অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। আমি ডাণ্ডা দিয়ে আর কাউকে আঘাত করলাম না।

'মাঝে মাঝে দু-একটা আমার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আমিও ওদের ঠেলে ফেলে দিচ্ছিলাম। একসময় আগুন একটু কমে এলো। আমার ভয় হল এবার হয়ত ওই ঘৃণ্য জীবগুলো আমাকে দেখতে পাবে। ভাবছিলাম ওরা দেখতে পাওয়ার আগেই ওদের বেশ কতকগুলোকে খতম করে ফেলব। কিন্তু আবার আগুন জোরে জ্বলে উঠল। আমি ওদের এড়িয়ে টিলাটার দিকে এগিয়ে গেলাম, যদি উইনাকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু উইনাকে দেখতে পেলাম না।

আমি টিলাটার উপর বসে পড়লাম। দেখতে লাগলাম ওই বীভৎস জীবগুলো আগুনের আলোর চোটে অন্ধ ও অস্থির হয়ে নিজেদের মধ্যে হুটোপুটি করে মরছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে সেই ধোঁয়ার ফাঁক দিয়ে দূরের নক্ষত্রদের দু-একটা উঁকি দিচ্ছে। দু-তিনটে 'মরলোক' ছুটে এসে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল। আমিও যথারীতি ঘুষির চোটে ওদের দূরে সরিয়ে দিলাম।

'সারারাত ধরে একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরের মধ্যে কাটালাম। বার বার ঘুম এসে যাচ্ছিল। আমি ঠোঁট কামড়ে ধরে জেগে থাকার চেষ্টা করছিলাম। হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিলাম। উঠে দাঁড়াচ্ছিলাম আবার বসছিলাম। এদিক ওদিক পায়চারী করছিলাম। চোখ রগড়াচ্ছিলাম আর ভগবানকে ডাকছিলাম,—হে ভগবান যেন কোন রকমে আর ঘুমিয়ে না পড়ি। তিনবার 'মরলোক'দের মাথা ঝুঁকিয়ে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখলাম। অবশেষে নিভে আসা আগুনের স্তিমিত লাল আলো, কুণ্ডলীপাকানো ধোঁয়া, আর কমে আসা এই নোংরা জীবদের ছাপিয়ে দিনের আলো দেখা দিল।

'আমি আবার উইনাকে খুঁজতে লাগলাম; কিন্তু ওর কোন চিহ্ন আমার নজরে পড়ল না। মনে হল উইনার দেহটা হয়ত জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে আছে। এই চিন্তা আমাকে কি খুশী করল তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। মনে হল অনিবার্য পরিণতির হাত থেকে হয়ত উইনা বেঁচে গেছে। কথাটা মনে আসতেই আমি আমার চারপাশের 'মরলোক'দের শেষ করার জন্য প্রায় উঠে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে নিরস্ত্র করলাম। এই টিলাটা জঙ্গলের মধ্যে একটা দ্বীপের মত। এর উপরে দাঁড়িয়ে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েও অস্পষ্টভাবে সবুজ চিনেমাটির প্রাসাদটা দেখতে পাচ্ছিলাম। সাদা স্ফিংকসের কাছে যেতে হলে কোন দিক দিয়ে এগুতে হবে তা বুঝতে আর আমার অসুবিধে হল না। তখনো কিছু 'মরলোক' টিলার নিচে ঘোরাফেরা

করছিল আর আর্তনাদ করছিল। আমি ওদের পাশ কাটিয়ে টিলা থেকে নামলাম। তারপর কিছু শুকনো ঘাস ছিঁড়ে পায়ে বেঁধে নিলাম। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পোড়া ছাই, ধোঁয়া ও নিভন্ত আগুনের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগলাম সেই সাদা স্ফিঙ্কসের উদ্দেশ্যে, যেখানে আমার কালযন্ত্রটাকে ওরা লুকিয়ে রেখেছে। আমি খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিলাম কারণ আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম তার উপরে পায়ের ব্যথায় খোঁড়াচ্ছিলাম। তাছাড়া উইনার এই বীভৎস মৃত্যুতে আমার সমস্ত মন হাহাকার করছিল। এরকম ভয়াবহ ঘটনা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। এখন এই পরিচিত নিজের ঘরে আপনাদের সামনে বসে মনে হচ্ছে স্বপ্নে কিছু হারিয়ে ফেলার দুঃখ ওটা, বাস্তবের সঙ্গে ওর কোন যোগ নেই। কিন্তু সেদিন সকালে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছিলাম—একেবারে নিঃসঙ্গ। আমি আমার এই ঘরের কথা ভাবছিলাম, এই ফায়ার প্লেসের কথা ভাবছিলাম, আপনাদের কারো কারো কথা ভাবছিলাম। আর এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার মনে একটা তীব্র অনুভূতি হচ্ছিল, যার অন্য নাম যন্ত্রণা।

'পোড়া ছাই, ধোঁয়া আর নিভন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে সেই সকালে যখন আমি হাঁটছিলাম তখন একটা জিনিস আবিষ্কার করে অবাক হলাম। আমার প্যান্টের পকেটে তখনো কয়েকটা দেশলাইএর কাঠি পড়ে রয়েছে।

দশ

'আটটা নটা নাগাদ আমি সেই বেঞ্চটায় এসে বসলাম, যে বেঞ্চে বসে প্রথম বিকেলে আমি এই জগতটাকে ভালভাবে দেখেছিলাম। আমি আমার পূর্ব সিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে হেসে ফেললাম। সেই আগেকার মতই সুন্দর দৃশ্য। সেই গাছপালা, সেই সমস্ত বিরাট বিরাট প্রাসাদ ও ভগ্নস্তূপ, সেই রূপোলী নদী তার দুই উর্বরা পাড়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। সেই সুন্দর পোষাক পরা ছোট ছোট সুন্দর মানুষগুলো এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। কেউ কেউ ঠিক সেই আগের জায়গাটিতে স্নান করছে, যেখানে আমি উইনাকে উদ্ধার করে ছিলাম। সব কিছুই আগেকার মত চলছে। কিন্তু আমার কাছে সব কিছুই কেমন যেন এলোমেলো লাগছে। সবই আছে, নেই শুধু আমার ছোট্ট উইনা। যে আমাকে ভালবেসেছিল, আমার পাশে নেচেছিল, গান শুনিয়েছিল, আমার হাতটাকে বালিশ করে যে আমার বুকের মধ্যে নির্ভয়ে ঘুমিয়েছিল। এরকম সব হারানোর তীব্র ব্যথা আর কখনো এমন কঠিনভাবে অনুভব করিনি।

'সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ চলে গেল চারপাশে ছড়ানো চিমনী-গুলোর দিকে। এখন আমি বুঝতে পারছি উপরের জগতের মানুষগুলো তাদের সৌন্দর্যের নিচে কি লুকিয়ে রেখেছে। ওদের দিনগুলো খুবই আনন্দের—চারণভূমিতে ছাগল বা ভেড়ার পালের কাছে দিন যেমন সুন্দর। ওদের পরিণতিও ওই ছাগল বা ভেড়ার পালের মতই।

'মানুষের সভ্যতার স্বপ্ন কত ক্ষণস্থায়ী! এতো আত্মহত্যারই নামান্তর। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে এগিয়ে গেছে এ সভ্যতা অতি দ্রুত—একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে যা স্থায়ী ও আত্মরক্ষায়

সক্ষম। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে—তা কি এই পরিণতির জন্য ? একদিন হয়ত জীবন ও সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। ধনীরা তাদের ধন সম্পত্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। শ্রমিকরা ভোগ করত জীবন ও জীবিকার অধিকার। সেই সুন্দর জগতে বেকারীত্বের ভয়াবহতা ছিল না, কোন সামাজিক সমস্যাই সেদিন সমাধান-হীন ভাবে পড়ে থাকে নি। চরম শান্তি বিরাজ করত সে জগতে।

একটা প্রাকৃতিক নিয়মের কথা হয়ত তারা ভুলে গিয়েছিল। বুদ্ধি-বৃত্তির প্রখরতা বাড়ে নিয়ত পরিবর্তন, বিপদ ও কষ্টের থেকে। একটা জন্তু তার পরিবেশের সঙ্গে যখন ঠিকমত খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকে তাকে বলা হয় সঠিক অবস্থা। অভ্যাস ও সংস্কারের কোন পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। যেখানে কোন রকম পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ হয় না। যে জীব বুদ্ধিমত্তায় সব থেকে উঁচু তাকে সব থেকে বেশী বিপদ ও নানা রকমের ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়।

'তাই, উপরের মানুষরা পরিবর্তিত হয়েছে দুর্বল ও অসার সুন্দরে আর নিচের মানুষরা গড়ে উঠেছে যান্ত্রিক দানব রূপে। এই সমাজে একটা বড় জিনিসের অভাব তা হচ্ছে স্থায়ীত্ব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিচের মানুষদের খাবারে টান পড়ল। প্রয়োজন বলে যে জিনিসটা বহুদিন ধরে ওরা ভুলে গিয়েছিল তা ফিরে এল। খাবারের খোঁজ পড়ল। যখন সব কিছু শেষ হয়ে এলো. তখন ওরা এমন জিনিস খেতে শুরু করল যা বহুকাল আগে পরিত্যক্ত হয়েছিল। আমার ব্যাখ্যা ভুলও হতে পারে তবে আমি যা দেখেছিলাম ও অনুভব করে-ছিলাম তাই আপনাদের বললাম।

'গত কয়েকদিনের পরিশ্রম, উত্তেজনা ও আতঙ্ক সবার উপরে ছোট্ট উইনার জন্য মানসিক কষ্ট থাকা সত্বেও এই বেঞ্চ, চারিদিকের স্বাভাবিক অবস্থা ও সূর্য কিরণের উষ্ণতা বেশ ভালই লাগছিল। আমি খুব পরিশ্রান্ত ছিলাম, বেশ ঘুম পাচ্ছিল। একটু বাদেই তাত্ত্বিক চিন্তা ছেড়ে

ঘুমের কোলে ঢোলে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমোলাম। সূর্য ডোবার কিছু আগে আমার ঘুম ভাঙল। আমি উঠে সাদা স্ফিঙ্কসের দিকে দিকে এগুতে শুরু করলাম। একহাতে ডাণ্ডাটা নিলাম আর অন্য হাত দিয়ে পকেটে দেশলাইএর কাঠিগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

'অভাবনীয় একটা কাণ্ড ঘটল। সাদা স্ফিঙ্কসের গোড়ায় পৌঁছে দেখলাম পিতলের দরজাটা খোলা।

'আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম দরজার সামনে। ইতস্ততঃ করতে লাগলাম ঢুকব কি ঢুকব না!

'ভিতরে ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের কোণে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড় করানো রয়েছে আমার কাল-যন্ত্রটা। ওটা চালাবার জন্য যে ছোট্ট লীভারটা দরকার সেটা খুলে আগেই পকেটে রেখে ছিলাম তা হয়ত আপনাদের বলেছি। ওটা তখনো পকেটেই ছিল। হাতের লোহার ডাণ্ডাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

'ভিতরে ঢুকতে যাওয়ার মুখে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। যা 'মরলোক'রাও ভাবতে পারে। আমি দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে একেবারে কাল-যন্ত্রের কাছে চলে গেলাম। যন্ত্রটা পরিষ্কার করে তেলটেল দিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে আমি তো তাজ্জব! আমি তো ভেবেছিলাম ওরা যন্ত্রটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

'আমি যখন যন্ত্রটাকে পরীক্ষা করে দেখে খুশী হয়ে উঠেছিলাম তখুনি ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ পিতলের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ফাঁদে এবার আমি আটকে পড়লাম।

'ওরা যখন আমাকে ছেঁকে ধরল তখন আমি ওদের হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। খুব শান্তভাবে আমি দেশলাইএর কাঠিটা জ্বালাবার চেষ্টা করলাম। একবার যদি লীভারটা যন্ত্রে লাগিয়ে ফেলতে পারি তাহলে আর আমাকে পায় কে?

'আপনারা নিশ্চয় আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন। ছোট ছোট যমদূতরা আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। একটা তো

আমাকে স্পর্শ করল। আমি হাতের লীভারটা এলোপাথাড়ি ঘোরাতে লাগলাম আর যন্ত্রের আসনটায় উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা হাত আমাকে চেপে ধরল, তারপর আর একটা। লীভারটা বাঁচাবার জন্য আমি প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দিলাম; আর ওটা যন্ত্রে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একবার তো ওরা প্রায় আমার হাত থেকে লীভারটা কেড়েই নিয়েছিল। আমি মাথা দিয়ে ওদের মাথায় গুঁতো মারতে লাগলাম। জঙ্গলের যুদ্ধ থেকে এ যুদ্ধ ছিল আরো মারাত্মক।

'অবশেষে একসময় লীভারটা যন্ত্রে লাগাতে সক্ষম হলাম। আমি লীভারে চাপ দিতেই ওই লিকলিকে আঙুলগুলো আমার শরীর থেকে সরে গেল। আমার চোখের সামনে থেকে অন্ধকার মুছে গেল।

এগারো

সময়-পর্যটনের সময় কি রকম অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা আমি আপনাদের আগেই বলেছি এবার তো ভালভাবে আসনটাতে বসতেও পারিনি। কোনরকমে কাত হয়ে যন্ত্রটার উপর দাঁড়িয়ে ওটাকে চালিয়ে দিয়েছিলাম। কতক্ষণ আমি চুপচাপ যন্ত্রটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। যখন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে যন্ত্রের ডায়ালের দিকে তাকালাম তখন কোথায় পৌঁছেছি দেখে বেশ চমকে উঠলাম। একটা ডায়াল—তার কাঁটা একঘর ঘুরলে বুঝতে হবে এক দিন কাটল, অন্য ডায়ালগুলোর কাঁটা কোনটা হাজার দিন, কোনটা দশ লক্ষ দিন, অন্যটা দশ কোটি দিন নির্দেশ করে। লীভারটা উল্টো দিকে না ঘুরিয়ে তাড়াতাড়িতে সোজা দিকে ঘুরিয়েছিলাম। সুতরাং আরো সুদূর ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছিলাম। দেখলাম হাজার দিনের কাঁটাটা ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মত দ্রুত ঘুরে চলেছে।

'যত সময় কাটতে লাগল তত অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল চারপাশে। কম্পিত ধূসর পটভূমি আস্তে আস্তে কালো হয়ে এলো। প্রচণ্ড গতিতে আমি ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছিলাম। পলকে দিন পলকে রাত্রির সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা আবার ফিরে এল। আগে এটা একটু দ্রুত হচ্ছিল কিন্তু পরে এই পরিবর্তন আরো আস্তে আস্তে ঘটতে লাগল। প্রথমে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সূর্যও আস্তে আস্তে আকাশ পরিক্রমা করতে লাগল। অবশেষে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল স্থায়ী উষার আলো। এরকম আলো দেখা দেয় যখন কোন ধূমকেতু আকাশ পরিক্রমা করে। সূর্য পূবদিক থেকে উঠছে আর পশ্চিমে ঝাঁপ দিচ্ছে আর ক্রমশঃ বড় আর লাল হয়ে উঠছে। চাঁদের কোন চিহ্ন নেই। নক্ষত্রদের ঘূর্ণনও ক্রমশঃ কমে আসছে। অবশেষে আমি থামার কিছু আগে বড় ও লাল সূর্য দিগন্তে স্তব্ধ হয়ে ঝুলে রইল। প্রকাণ্ড আগুনের গোলক জ্বলতে লাগল উত্তাপহীন ভাবে। মাঝে মাঝে ওটা যেন নিভে যাচ্ছিল। একবার কিছুক্ষণের জন্য দপ করে উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠল তারপর আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে গেল। আমার মনে হল যে জোয়ারের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। পৃথিবী একটা মুখ সূর্যের দিকে ফিরিয়ে আছে—আমাদের সময় চাঁদ যেমন পৃথিবীর দিকে সব সময় একটা মুখ ফিরিয়ে থাকত তেমনি। খুব সাবধানে আমি লীভারটা উল্টোদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করলাম। ডায়ালের কাঁটাগুলোর গতি কমে এলো। হাজার দিনের কাঁটাটা একদম থেমে গেল শুধু দিনের কাঁটাটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর দিনের কাঁটাটার গতিও কমে এলো। আমি একটা নির্জন সমুদ্র সৈকতের অস্পষ্ট আভাস পেলাম।

'খুব আস্তে আস্তে যন্ত্রটা থেমে গেল। আমি আসনে বসে চারিদিকে লক্ষ করতে লাগলাম। আকাশের রঙ আর নীল নেই। উত্তর-পূর্ব দিকে দোয়াতের কালির মত কালো আকাশ। আর সেই কালো আকাশের বুকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের দল স্থির ভাবে জ্বলছে। মাথার

উপর গাঢ় লাল আর সেখানে কোন তারা নেই। দক্ষিণ-পূর্বদিকে উজ্জ্বল। ওখানে লাল সূর্য স্থির হয়ে রয়েছে। আমার উল্টোদিকের পাহাড়গুলোর রঙ লালচে। জীবন্ত জিনিস বলতে প্রথমে যা দেখতে পেলাম তা হচ্ছে সবুজ ঘাস। মস বা ফার্ণের মত জিনিসও রয়েছে।

'ঢালু সৈকতে যন্ত্রটা দাঁড়িয়ে ছিল। সমুদ্র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। কোন তরঙ্গ নেই কোন ঢেউ নেই। একফোঁটা হাওয়া নেই। একটা তেলতেলে সরের মত কিছু সমুদ্রের বুকে ওঠানামা করছিল। ওই দেখে মনে হচ্ছিল সমুদ্র এখনো একেবারে মরে যায়নি। পাড় বরাবর পুরু লবণের স্তর জমে রয়েছে। আমার কিরকম যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি খুব তাড়াতাড়ি শ্বাস নিচ্ছিলাম। এই অনুভূতিটা আমাকে পাহাড়ের উপরে ওঠার কথা মনে করিয়ে দিল। বুঝলাম এখানে বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ অনেক কম।

'উপরের দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ আমার কানে ভেসে এল। চমকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড সাদা প্রজাপতির মত কিছু আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পতঙ্গটার ডাক এমনই বিশ্রী যে আমি ভয়ে কেঁপে উঠলাম ও শক্ত হয়ে যন্ত্রের আসনে বসে রইলাম। একসময় ওটা পিছনের পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হল। চারপাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। আমার খুব কাছে এতক্ষণ যে লাল রঙের পাহাড়ের চাঁইটা পড়ে ছিল সেটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। এতক্ষণ যেটাকে পাথরের চাঁই বলে মনে করেছিলাম সেটা আসলে একটা বিরাট কাঁকড়া জাতিয় জীব। ভাবতে পারেন একটা কাঁকড়ার চেহারা একটা বিরাট টেবিলের মত? একগাদা পা নাড়াচ্ছে? বড় বড় দাঁড়া ঘোরাচ্ছে,? লম্বা লম্বা শুঁড় দোলাচ্ছে? চোখের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা বড় বড় চোখ আপনার দিকে ভয়ঙ্কর ভাবে তাকিয়ে আছে? পিঠটা ঢেউ খেলানো, পিঠের উপর শ্যাওলার আস্তরণ?

'আমি যখন ওই বিদঘুটে জীবটার এগিয়ে আসা লক্ষ করছিলাম

তখন হঠাৎ আমার গালের উপর কি একটা যেন উড়ে এসে বসল। আমি ওটাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পর-মুহূর্তে আবার ওটা ছুটে এসে বসল। আরো একটা এসে বসল আমার কানের উপর। আমি গালে চাপড় মেরে সুতোর মত কিছু একটা ধরে ফেললাম। কিন্তু কে যেন আমার হাত থেকে ওটা টেনে নিল। ভয়ে আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলাম ওইরকম আর একটা বড় কাঁকড়া আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ওরই শুঁড় মাছি মনে করে আমি চেপে ধরেছিলাম। ওর কুঁৎকুঁতে চোখ গর্তের বাইরে নড়াচড়া করছে। ওর মুখে জান্তব ক্ষুধা আর ওর বিরাট দাঁড়াদুটো আমার দিকে নেমে আসছে হিংস্র আক্রোশে। মুহূর্তের মধ্যে আমার হাত যন্ত্রের লীভারের উপর চলে গেল। আমার ও এই রাক্ষুসে কাঁকড়ার মধ্যে আমি একমাসের সময়ের ব্যবধান টেনে দিলাম। আমি সেই একই সমুদ্র সৈকতে দাঁড়িয়েছিলাম। এবারও দেখতে পেলাম সৈকতে গাদা গাদা রাক্ষুসে কাঁকড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'জনমানব শূন্য এই পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই। রক্তিম পূবের আকাশ, উত্তর দিকটা কালো, লবণাক্ত মৃত সমুদ্র, পাথুরে সৈকত ও দানবীয় কাঁকড়ার বিচরণ, ফুসফুসে চাপ পড়ার মত হাল্কা অক্সিজেন, কম বাতাস, সব মিলে সে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

আমি আরো একশ বছর এগিয়ে গেলাম। সেই বিরাট উত্তাপ-হীন লাল সূর্যকে আরো বড মনে হচ্ছে। উত্তাপ আরো কমে এসেছে। সেই মরণোন্মুখ সমুদ্র, সেই ঠাণ্ডা হাল্কা বাতাস, সেই কাঁকড়ার দল সবুজ প্রান্তর আর পাহাড়ের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পূবের আকাশে একটা বাঁকা মলিন রেখা দেখতে পেলাম—হয়ত চাঁদ।

আমি আরো এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। হাজার বছরের ব্যবধানে এক-আধবার থামতে লাগলাম। পৃথিবীর শেষ পরিণতি দেখার জন্য আমার মন তখন উৎসুক। দেখলাম সূর্য ক্রমশঃ বড় হচ্ছে ও উত্তাপহীন হয়ে আসছে।

জীবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। এখন থেকে তিরিশ লক্ষ বছর পরে সূর্য প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আমি এখানে একবার থামলাম। সেই দানবীয় কাঁকড়ার দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। লাল সমুদ্র সৈকত সম্পূর্ণ মৃত। শুধু মাঠঘাট ভরে রয়েছে সাদা রঙের বড় বড় ঘাসে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার কাঁপুনী শুরু হয়ে গেল। সাদা সাদা বরফের পাপড়ি ঝরে পড়ছে। উত্তর-পূব দিকের বরফের উপর নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল। সমস্ত পাহাড়ের চূড়ো বরফে ভর্তি। সমুদ্রের ধারে ধারে বরফের স্তূপ। কিন্তু সমুদ্র এখনো জমে যায়নি।

'আমি চারপাশে তাকালাম, যদি কোন জীবন্ত প্রাণী চোখে পড়ে এই আশায়। কি এক অজানা কৌতূহলে আমি তখনো কাল-যন্ত্রের আসনে বসেছিলাম। কিন্তু আমার চোখে কোন জীবন্ত প্রাণী পড়ল না। না ডাঙায়, না সমুদ্রে না আকাশে। পাহাড়ের উপরের সবুজ আঁঠালো আস্তরণ দেখে মনে হল জীবন একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এক জায়গায় একটা বালির চড়া পড়ায় সমুদ্র দূরে সরে গেছে। আমার মনে হল ওই চড়ায় একটা কালো কিছু নড়াচড়া করছে। কিন্তু ভাল করে তাকাতেই ওটা নিশ্চল হয়ে পড়ল। মনে হল চোখের ভুল, ওটা একটা পাথরের চাঙড় ছাড়া আর কিছু নয়। আকাশের নক্ষত্ররা অনেক বেশী উজ্জ্বল।

'হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পশ্চিশ আকাশে সূর্যের ছায়াটা যেন বদলে গেছে। একদিক যেন অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। মনে হল একটা ছায়া ক্রমশ সূর্যকে গ্রাস করছে। আমি হতভম্বের মত কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। যে সামান্য আলোটুকু ছিল তাও মুছে যাচ্ছিল, আর ঠিক তক্ষুণি আমি বুঝতে পারলাম সূর্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। হয় চাঁদ অথবা বুধ সূর্যের উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে চাঁদের কথাই মনে হয়েছিল; পরমুহূর্তে মনে হল চাঁদের থেকে ভিতরের দিকের কোন গ্রহ হওয়াই এ অবস্থায় খুব স্বাভাবিক।

'অন্ধকার বাড়তে লাগল। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকা বইতে শুরু

করল পূব দিক থেকে। আর বরফের পাপড়ি বেশী করে পড়তে লাগল মাথার উপর থেকে। সমুদ্রের ধার থেকে একটা ফিসফিসানীর শব্দ ভেসে এল। এইটুকু ছাড়া সারা পৃথিবী নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতার কোন তুলনা দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষের কথাবার্তা, ভেড়ার ডাক, পাখিদের কাকলী, পতঙ্গদের গুঞ্জন, যা আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতো-প্রোতভাবে মিশে আছে—তা সব শেষ হয়ে গেছে। অন্ধকার যত গাঢ় হতে শুরু করল তত বরফ পড়া বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল ঠাণ্ডা। অবশেষে দূরের পাহাড়ের চূড়োগুলো দ্রুত অদৃশ্য হতে লাগল। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। আমার মনে হল সূর্যের বুকের কালো ছায়াটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। পরমুহূর্তে মলিন তারাগুলোই শুধু দেখা যেতে লাগল। আর সব ঢাকা পড়ল অন্ধকারের নীচে। আকাশ নিকষ কালো।'

'অন্ধকারের আতঙ্ক আমাকে যেন গ্রাস করল। ঠাণ্ডায় আমার হাত পর্যন্ত কেঁপে উঠছিল। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। আমি কাঁপতে লাগলাম। গা গুলিয়ে উঠল। পরমুহূর্তে লাল ধনুকের মত সূর্যের প্রান্তরেখা আবার আকাশের বুকে ফুটে উঠল। নিজেকে সামলা-বার জন্য আমি কাল-যন্ত্রের আসন থেকে নেমে দাঁড়ালাম। আমার মাথা ঘুরছিল। বুঝতে পারছিলাম ফিরে যাওয়ার মত শক্তি বোধহয় আর আমার শরীরে নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন ধুঁকছি ঠিক তখুনি আবার সেই পাহাড়ের চাঙড়টাকে নড়তে দেখলাম। এবার আর কোন চোখের ভুল নয়। জিনিসটা সত্যিই এগিয়ে আসছে। গোলমত জিনিসটা, হয়ত ফুটবলের মত হবে কি তার চেয়ে একটু বড়। এক গাদা শুঁড় মাটিতে লুটোচ্ছে। জিনিসটার রঙ কালো বলে মনে হচ্ছিল। জিনিসটা লাফাতে লাফাতে এগুচ্ছিলো। মনে হল আমি এক্ষুণি অজ্ঞান হয়ে যাব। কিন্তু অসহায়ের মত এই সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে চিরদিনের মত পড়ে থাকতে হবে এই আতঙ্কে আমি একটু সজাগ হয়ে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে আসনে বসে পড়লাম।

বারো

'অবশেষে আমি ফিরে এলাম। কাল-যন্ত্রের উপর অনেকক্ষণ আমি হয়ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তারপর শুরু হয়েছিল দিন রাত্রির পরপর পরিক্রমা, সূর্য আবার সোনালী হয়ে উঠেছিল, আকাশ হয়ে উঠেছিল নীল। আমি ভালভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছিলাম। ডায়ালের কাঁটাগুলো উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল। অবশেষে বাড়ীঘরের অস্পষ্ট ছায়া দেখতে পেয়েছিলাম। সেসবও দ্রুত সরে গিয়ে অন্য কিছুর আবির্ভাব ঘটেছিল। যখন দশলক্ষ দিনের কাঁটা শূন্যে পৌঁছুলো তখন আমি গতি কমালাম। আমাদের কালের অকিঞ্চিৎকার ভাস্কর্য্য দেখতে পেলাম ও চিনতে পারলাম। হাজার দিনের কাঁটাও শূন্যের ঘরে চলে এল। দিন ও রাত্রি আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে লাগল। তারপর আমার চারপাশে আমার পুরোনো গবেষণাগারের দেওয়াল দেখতে পেলাম। খুব আস্তে আস্তে আমি যন্ত্রটাকে থামালাম।

'একটা ছোট্ট জিনিস আমার কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল। আপনাদের আগেই বলেছি যে যখন আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম তখন আমার যন্ত্রের গতি খুব দ্রুত হওয়ার আগে মিসেস ওয়াচেট ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আমার মনে হয়েছিল উনি যেন রকেটের মত দ্রুত আমার সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। আমি যখন ফিরে এলাম তখনও তিনি ঘরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এবার তার গতি গতবারের ঠিক উল্টো। নীচের কোণার দিকে দরজা খোলা ছিল আর উনি আস্তে আস্তে গবেষণাগারে উঠে এলেন। পর মূহূর্তে দরজার আড়ালে চলে গেলেন যার ভিতর দিয়ে একটু আগেই উনি উঠে এসেছিলেন।

'যন্ত্র থামিয়ে আমি আমার চারপাশে তাকালাম। সব পরিচিত

জিনিস চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার পুরোনো গবেষণাগার, চৌকি, যন্ত্রপাতি—যেভাবে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনিভাবে পড়ে রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি কাল-যন্ত্রের আসন থেকে নেমে নিজের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। বেশ কয়েক মিনিট ধরে আমি কাঁপতে লাগলাম। তারপর আমি শান্ত হলাম। আমার চারপাশে আমার গবেষণাগার যেমন থাকার কথা ঠিক তেমনি আছে। হয়ত এই বেঞ্চে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত স্বপ্ন।

'না। তা হয়ত নয়! ব্যাপারটার শুরু হয়েছিল গবেষণাগারের দক্ষিণ-পূব কোণ থেকে কিন্তু কাল-যন্ত্রটা এখন দাঁড়িয়ে আছে উত্তর পশ্চিম কোণে। এ থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন লন ও সাদা স্ফিঙ্কসের নীচের ঘরের দূরত্ব। যেখানে 'মরলোক'রা আমার কাল-যন্ত্রটাকে লুকিয়ে রেখেছিল।

'কিছুক্ষণের জন্য আমার কোন হুশ ছিল না। তারপর আমি আস্তে আস্তে উঠে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে এসেছি। খোঁড়াচ্ছি কারণ আমার গোঁড়ালির যন্ত্রণা এখনো কমেনি। টেবিলের উপর 'পলমল গেজেট' দেখতে পেলাম। দেখলাম ওটা আজকের কাগজ। টাইম-পিসটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় আটটা বাজে। আমি আপনাদের কণ্ঠস্বর ও থালা-বাসন নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি একটু ইতস্ততঃ করলাম। নিজেকে অসুস্থ ও দুর্বল লাগছিল। মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকতে আমি দরজা খুলে ফেললাম। বাকিটা তো আপনারা জানেন। আমি হাতমুখ ধুলাম, খেলাম, এতক্ষণ আপনাদের গল্প শোনালাম।

আমি জানি সমস্ত ব্যাপারটাই আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। তবে আমার নিজের কাছে একটা জিনিস অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, তা এই যে আমি আবার আমার নিজস্ব পুরোনো ঘরে বসে আপনাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি আর, আপনাদের কাছে আমার অদ্ভুত অভিযানের গল্প বলছি।

ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে সময় পর্যটক বলে উঠলেন—'না, এসব আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। ধরুন সবটাই আমার বানানো গল্প—, অথবা ফালতু ভবিষ্যদ্বাণী। ধরুন গবেষণাগারের ছোট্ট কারখানায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি এই স্বপ্নটা দেখেছি। হয়ত এই গল্পটা বানাবার আগে আমি মানুষের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভাবছিলাম। আমার এ কাহিনী একটা শিল্পকর্ম বলে মনে করুন। যার মাধ্যমে আমি মানুষের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা বলতে চেয়েছি। যাহোক গল্পটা আপনাদের কেমন লাগল?'

উনি ওঁর পাইপটা তুলে নিলেন তারপর সেই পুরোনো ভঙ্গিতে ওটা ফায়ার-প্লেসের রডে ঠুকঠুক করে ঠুকতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য কেউ কোন কথা বললেন না। তারপর চেয়ার টানার ও কার্পেটের উপর জুতো ঘসার শব্দ শোনা গেল। সময় পর্যটকের মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে আমি ওঁর অন্য শ্রোতাদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। তাঁরা অন্ধকারে বসে আছেন। ডাক্তারবাবু খুব মনযোগ দিয়ে আমাদের নিমন্ত্রণ-কর্তার কথা শুনছিলেন। সম্পাদকমশায় তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওর ছ'নম্বর চুরুটের ডগাটা লক্ষ্য করছিলেন। সাংবাদিকটি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর অন্যেরা সবাই নিশ্চল হয়ে বসে ছিলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সম্পাদকমশায় উঠে দাঁড়ালেন,—'ভাগ্যিস আপনি লেখক নন, তাহলে কি যে করতেন, বলে সময়-পর্যটকের কাঁধে হাত রাখলেন।

'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন নি।'

'মানে............'

'আমার মনে হচ্ছে আপনি বিশ্বাস করেন নি।' সময় পর্যটক আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, 'দেশলাই কই?' তারপর কাঠি জ্বালিয়ে পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি···আমি নিজেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। কিন্তু তবুও......'

টেবিলের উপর পড়ে থাকা শুকনো ফুলছুটো দেখতে লাগলেন উনি।

তারপর পাইপ ধরে থাকা হাতের দিকে তাকিয়ে আঙুলের গাঁটের আধ-শুকনো ঘা গুলো লক্ষ্য করতে লাগলেন।

ডাক্তার বাবু উঠে এগিয়ে এসে ফুলত্নটো পরীক্ষা করে দেখলেন—। তারপর কি একটা ল্যাটিন নাম আওড়ালেন। মনস্তত্ত্ববিদ একটু ঝুঁকে একটু নমুনার জন্য হাত বাড়ালেন।

'পৌনে একটা বাজে। কি করে বাড়ি পৌঁছুবো', বলে উঠলেন সাংবাদিকটি।

'স্টেশনে অনেক গাড়ি পাবেন', বললেন মনস্তত্ত্ববিদ।

'বিচিত্র জিনিস। কিন্তু এটার স্বাভাবিক গন্ধ কিরকম তা জানি না। আমি কি এটা শুঁকে দেখতে পারি?' ডাক্তারবাবু ফুলটা হাতে নিয়ে জানতে চাইলেন।

সময়-পর্যটক একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর বলে উঠলেন,—'না কখ্খনো না।'

'আপনি এগুলোকে কোথায় পেয়ে ছিলেন?' ডাক্তারবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

সময়-পর্যটক মাথায় হাত রাখলেন। তিনি এমন ভাবে কথা বলতে শুরু করলেন, মনে হল তিনি যেন একটা বিস্মৃত ঘটনা মনে করার চেষ্টা করছেন।

'ও'লো উইনা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।' তিনি ঘরের চারিদিকে তাকালেন।—'জানি না এসব সত্যি কি না? এই ঘর, আপনারা আর এই দৈনন্দিন পরিবেশ আমার কাছে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। আমি কি সত্যিই কোন কাল-যন্ত্র তৈরী করেছি, নাকি একটা নমুনা তৈরী করেছি? সব কি তাহলে স্বপ্ন? অনেকে বলেন জীবন একটা স্বপ্ন—কোন কোন সময় তা খুবই সত্যি। কিন্তু এরকম স্বপ্ন আমি আর দ্বিতীয়বার দেখতে চাই না। এ পাগলামী। কোথা থেকে এ স্বপ্ন এল? আমি একবার যন্ত্রটাকে দেখতে চাই······সত্যিই ওটা গবেষণাগারে আছে কি না তা যাচাই করে নিতে চাই!'

তাড়াতাড়ি উনি বাতিটা নিলেন, তারপর দরজা পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়লেন। আমরা ওকে অনুসরণ করলাম। মোমবাতির কম্পিত আলোয় যন্ত্রটাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিম্ভূত একটা যন্ত্র, পিতল, কাঠ, গজদন্ত ও স্ফটিকের তৈরী—। হাত দিয়ে স্পর্শ করে বুঝলাম ওটা কঠিন জিনিস। আমি ওর রেলিং-এ হাত রাখলাম। গজ-দন্তের উপর বেগুনী ছোপ দেখতে পেলাম। নিচের দিকে কিছু ঘাস ও মস। লেগে রয়েছে বলে মনে হল। একটা রেলিং বেঁকে দুমড়ে গেছে তাও লক্ষ্য করলাম।

সময়-পর্যটক বাতিটা বেঞ্চের উপর বসালেন তারপর দুমড়ে যাওয়া রেলিংটা দেখিয়ে বললেন 'ঠিক আছে। যা বলেছি সব সত্যি। ঠাণ্ডার মধ্যে আপনাদের এখানে টেনে আনার জন্য দুঃখিত।' উনি বাতিটা তুলে নিলেন। আমরা নিঃশব্দে ধূমপান করার ঘরে ফিরে এলাম। উনি আমাদের সঙ্গে হলঘরে এলেন তারপর সম্পাদকমশাইকে কোট পরতে সাহায্য করলেন। ডাক্তারবাবু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি বিশ্রাম করুন খুব খাটুনি গেছে আপনার।' শুনে উনি একটু হাসলেন। তারপর খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সবাইকে উনি শুভ-রাত্রি জানালেন।

আমি সম্পাদকমশায়ের সঙ্গে এক গাড়িতে উঠলাম। ওর মতে গল্পটা বেশ চটকদার। আমি নিজে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলাম না। গল্পটা যেমনি অদ্ভুত তেমনি অবিশ্বাস্য ; কিন্তু বলাটা এত সুন্দর যে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়। সারারাত ঘুমুতে পারলাম না। ওই একটা ব্যাপার নিয়ে ভাবতে লাগলাম। ঠিক করলাম পরদিন আবার সময়-পর্যটকের সঙ্গে দেখা করব। সকালে গিয়ে শুনলাম উনি গবেষণা-গারে আছেন। আমি কোন খবর না দিয়ে সোজা ওর কাছে চলে গেলাম। কিন্তু গবেষণাগারে কেউ নেই। আমি কাল-যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারপর একটু ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে যন্ত্র-চালানো লীভারটায় হাত দিয়ে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই কিম্ভূত যন্ত্রটা ঝড়ে

কাঁপা ডালের মত কেঁপে উঠল। লীভারটা এত স্পর্শকাতর তা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে হল, যখন আমাকে কোন নতুন জিনিসে হাত দিতে সবাই বারণ করত। আমি বারান্দা দিয়ে ফিরে এলাম। ধূমপান করার ঘরে সময় পর্যটকের সঙ্গে আমার দেখা হল। উনি তখন কোথাও বেরুবার জন্য তৈরী হয়ে ছিলেন। একহাতে একটা ক্যামেরা অন্য হাতে একটা ছোট ব্যাগ। আমাকে দেখে উনি হাসলেন এবং বললেন, 'আমি খুব ব্যস্ত আছি। ওই ব্যাপারটা নিয়ে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা তো ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই না। সত্যি সত্যি কি আপনি ভবিষ্যতে পাড়ি দিয়েছিলেন?'

সত্যিই আমি গিয়েছিলাম', জবাব দিলেন উনি। তারপর সোজা আমার চোখের দিকে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। তারপর ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসছি। আমি জানি কেন আপনি আজ এসেছেন। এসেছেন যখন তখন একটু অপেক্ষা করুন। এখানে অনেক পত্রপত্রিকা আছে আপনি যদি মধ্যাহ্নভোজ পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করেন তাহলে এই সময়-পর্যটনের অনেক নমুনা আপনাকে দেখাতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস। আমি এখন যাচ্ছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

ওঁর কথার অর্থ ভালভাবে না বুঝেই আমি সম্মতি দিলাম। উনি একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বারান্দা পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন। গবেষণাগারের দরজা খোলার শব্দ পেলাম! আমি একটা সোফায় বসে সেদিনের কাগজটা তুলে নিলাম। মধ্যাহ্নভোজের মধ্যে কি এমন উনি করতে চলেছেন? হঠাৎ কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে মনে পড়ল যে প্রকাশক রিচার্ডসনের সঙ্গে দুটোর সময় আমার দেখা করার কথা আছে। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম হাতে খুবই অল্প সময় আছে। আমি লাফিয়ে উঠে বারান্দা দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। সময়পর্যটককে কথাটা জানানো দরকার।

গবেষণাগারের দরজার হাতলে হাত দিতে না দিতে আমি শুনতে পেলাম আনন্দ উচ্ছ্বাস। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া আমার চারপাশে বয়ে গেল। আর সেই বাতাসের ঘূর্ণির ভিতর থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরো পড়ার শব্দ উঠল। সময়-পর্যটককে ঘরে দেখতে পেলাম না। আমার মনে হল একটা অস্পষ্ট আবছা চেহারা একটা চেয়ারে বসে প্রচণ্ড জোরে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই চেহারাটা এতই স্বচ্ছ যে ওপাশের বেঞ্চের উপর রাখা নক্সাগুলো ওর ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। চোখ রগড়াতেই সেই ভৌতিক অশরীরি ছায়াটা মিলিয়ে গেল। কাল-যন্ত্রটাকে ঘরের মধ্যে আর দেখতে পেলাম না। সারা ঘর শূন্য। একটা স্কাইলাইটের কাঁচ ভাঙা বলে মনে হল।

আমি যেন কিরকম জবুথবু হয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য কিছু একটা আমার চোখের সামনেই ঘটে গেল। আমি যখন ওইরকম অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম, তখন বাগানের দিকের দরজাটা খুলে বাড়ির চাকর ঢুকল।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। ব্যাপারটা একটু একটু করে আমার বোধগম্য হচ্ছিল।—'আচ্ছা মিঃ···কি এই দরজা দিয়ে বাইরে গেছেন ?' চাকরটাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'না তো। এ দরজা দিয়ে কেউ বেরোননি। আমি তো ওঁকে খুঁজতেই এখানে এলাম', ও জবাব দিল।

ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে এল। প্রকাশকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা মুলতুবী রেখে আমি সময়-পর্যটকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম দ্বিতীয়বার সময়-পর্যটনের আশ্চর্য-জনক কাহিনী শোনার জন্যে এবং নমুনা ও ফটো দেখার জন্য। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সময়-পর্যটকের জন্যে আমাকে হয়ত অনন্তকাল বসে থাকতে হবে। তিন বছর আগে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন।

উপসংহার

অবাক না হয়ে উপায় নেই। সত্যিই কি তিনি কোনদিন ফিরে আসবেন? হয়ত তিনি অতীতে চলে গিয়েছেন। হয়ত পৌঁছে গেছেন আদি প্রস্তর যুগের রক্তপিপাসু লোমশ জংলীদের মধ্যে; কিম্বা অলবণাক্ত সমুদ্রের পাড়ে পৌঁছে গেছেন। কিম্বা বিরাট টিকটিকিদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথবা জুরাসিক যুগের ভয়াবহ দানবাকৃতি সরীসৃপদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন। হয়ত তিনি এখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন কোন প্রবাল দ্বীপে যেখানে প্লেসিওসেরাসদের বাস। কিম্বা ট্রিয়াসিক যুগের লোনাজলের কোন নির্জন হ্রদের পাড়ে হয়ত দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি। হয়ত বা ভবিষ্যতেই আবার পাড়ি জমিয়েছেন। হয়ত আমাদের সময়ের কাছাকাছি এমন কোন যুগে গিয়ে পৌঁছেছেন যেখানে মানুষ এখনো মানুষ। এবং আমাদের যুগের অজানা সব রহস্যকেই যারা সমাধান করে ফেলেছে। মানুষ যেখানে সভ্যতার চরমসীমায় পৌঁছে গেছে। কাল-যন্ত্র তৈরীর করার বহু আগে থাকতেই এসব কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। ওঁর ধারণা ছিল মানুষের সভ্যতাই একদিন মানুষকে ধ্বংস করবে। জানি না ওঁর ধারণা কত-খানি সত্যি; আমার কাছে ভবিষ্যতে এখনো অন্ধকার কিম্বা আমি হয়ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সে যাই হোক আমার কাছে দু'টুকরো অদ্ভুতদর্শন ফুলের পাঁপড়ি রয়েছে। মানুষ যখন তার শক্তি, মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি সব হারিয়েছে তখনো তার মধ্যে ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধটুকু নষ্ট হয়নি, এই শুকনো ফুলের পাঁপড়ি দুটো তারই সাক্ষী।

———

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস (১ম/২য় খণ্ড)	...	৫০·০০
গোল্ডেন রঁাদেভ্যু—অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন	...	১২·০০
বেয়ার আইল্যাণ্ড ॥ অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন	...	১৮·০০
লাস্ট ফ্রন্টিয়ার ॥ ঐ	...	১৮·০০
আমাজনের উজানে—জুল ভের্ন	...	১১·০০
ক্রিমিনাল অমনিবাস—কনিষ্ঠ পাণ্ডব সম্পাদিত	...	১৫·০০
ভয়ের সংকেত—এলারী কুইন	...	১০·০০
নিষিদ্ধ প্রবেশ—ডরোথি সেয়ার্স	...	১০·০০
মৃত্যুর চোখ নীল—জন ল্যাঙ	...	১১·০০
দাঁড়ান ! অন্ধকার হোক—হেনরী শ্লেজার	...	১০·০০
দি ফক্স ॥ ডি. এইচ. লরেন্স	...	১০·০০
মার্ডার ইন স্পোর্টস জয়ন্ত দত্ত	...	১৪·০০
সানি গাভাসকার (২য় মুদ্রণ)— ঐ	...	১১·০০
ড্রাগনের মুখে ব্রুস লী (২য় মুদ্রণ) ঐ	...	৮·০০
কখন খেলার ছলে ঐ	...	৬·০০
দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষে—দ্বৈপায়ন	...	৭·০০
একই বৃত্তে ক'জন—শেখর সেনগুপ্ত	...	৫·০০
সমুদ্র মন্থনে বিষ—সঞ্জয় দাশগুপ্ত	...	৮·০০
ডোরাকাটার রক্ততৃষ্ণা—সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়	...	১০·০০

মডার্ণ কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯